দিল্লী

ওয়াশিংটন মস্কো

হুমায়ুন কবির

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট • কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭১
তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

শ্রীমনোজ বসু

প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

চতুরঙ্গে আমেরিকা এবং সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেগুলি একত্রিত করে এই বইখানি প্রকাশিত হল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারের উৎসাহ এবং উদ্যোগই এই সংকলনের জন্য প্রধানত দায়ী, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

১৯৫৬ সালে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কয়েকটি সমস্যার সমাধানের জন্য উপদেষ্টা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম বলে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী ভালভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। শিক্ষার প্রভাব সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তাই শিক্ষার বিষয় আলোচনা করতে গেলে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ এড়ানো যায় না। দেশের সমগ্র জীবনের বিকাশের ফলে শিক্ষা প্রণালী গড়ে উঠে, আবার শিক্ষার প্রভাবে সর্বাঙ্গীন জীবন বদলে যায়। আমেরিকাবাসী সর্বদাই আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপৃত, তাই শিক্ষা ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমেরিকায় যত স্পষ্ট, অন্য দেশে বোধ হয় তার তুলনা মেলে না।

সেই বছরেই ভারতীয় শিক্ষামিশনের নায়ক হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্বে পড়েছি, গিয়ে দেখলাম যে সোভিয়েট রাষ্ট্র সজ্ঞানে শিক্ষাকে সমাজগঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এক বিরাট শিক্ষা প্রচেষ্টা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। রুশ বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই তাই লেনিন বলেছেন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন আনবার জন্য প্রথম চাই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, এবং একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো যায়। তাই আজন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিক নানাভাবে শিক্ষালাভ করছে, এবং সেই বিরাট শিক্ষাপ্রচেষ্টার ফলে সমাজে যে বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে সে কথা মানতেই হবে।

প্রথম দৃষ্টিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যগুলিই চোখে পড়ে। পার্থক্য রয়েছেও বহু—তাদের ইতিহাস

আলাদা, সমাজ সংগঠন বিভিন্ন এবং জীবন আদর্শ স্বতন্ত্র। সাম্যবাদ বা পুঁজিবাদে যাঁদের অন্ধবিশ্বাস, তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র দুটির সংগঠন ও আদর্শ কেবলমাত্র বিভিন্ন নয়, সম্পূর্ণভাবে পরস্পরবিরোধী। রাষ্ট্র দুটির মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনায় যে একদিকে চীনা কম্যুনিস্ট ও অন্যদিকে বার্চ সোসাইটীর সদস্য আঁতকে উঠছেন, তা আকস্মিক বা অকারণ নয়। মুক্তবুদ্ধি দিয়ে যাঁরা রাজনীতি বুঝতে চান, রাষ্ট্র দুটির বিচার করতে চান, তাঁরা কিন্তু তাদের মধ্যে বহু বিষয়ে অমিলের চেয়ে মিলই বেশী দেখতে পান। দ্য তকভিল একশো বছর আগে রাষ্ট্র দুটি সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, আজ সেগুলি পূর্ণ হতে চলেছে এবং স্বভাবতই তাদের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন কমে আসছে।

সমস্ত পৃথিবীতেই আজ নতুন নতুন পরিবর্তনের চাঞ্চল্য। সে পরিবর্তনের গতি আমেরিকায় এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে আরো তীব্র। সাত বছর আগে আমেরিকার এবং পাঁচ বছর আগে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিষয়ে যা লিখেছিলাম, তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তাই নিশ্চয়ই প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তনে কিন্তু সময় লাগে এবং সে পরিবর্তনের প্রভাব সমাজে ছড়িয়ে পড়তে আরো বেশী সময় লাগে। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের জীবন প্রবাহকে বুঝতে চেয়েছিলাম বলে এ প্রবন্ধগুলি হয়তো আজো একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি।

আজ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মন জানাজানি ও বন্ধুত্ব না হলে পৃথিবীর কল্যাণ নাই। বিশেষ করে এই দুটি বিরাট রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব আজ বিশ্বশান্তির অন্যতম নিয়ামক। এ প্রবন্ধগুলি যদি এ দুটি রাষ্ট্রের জীবন ও আদর্শ বুঝতে বাঙালী পাঠককে খানিকটাও সাহায্য করে, তবে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

নয়াদিল্লী
২২শে মে ১৯৬৪

হুমায়ুন কবির

ওয়াশিংটনের চিঠি

॥ এক ॥

প্রথম দৃষ্টিতে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পার্থক্যগুলিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়—এবং পার্থক্য যে বহু রয়েছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান পৃথিবীতে যে যন্ত্রযুগ চলেছে, তার পরাকাষ্ঠা হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ভারতবর্ষে আজো আমরা যন্ত্রসভ্যতার বুনিয়াদ পুরোপুরি স্থাপন করতে পারিনি। ভারতবর্ষে শতকরা আশীজন লোক গ্রামবাসী, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। আমেরিকায় শতকরা পনেরো জনেরও কৃষিকাজের সঙ্গে কোন যোগ নেই—অধিকাংশ লোক নগরে শহরে জনপদে বাস করে। তবু আমেরিকা যে-ফসল উৎপাদন করে, তাতে সকলে পর্যাপ্ত খেয়ে-দেয়েও তারা পৃথিবীময় খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয় খোরাক জোটাতে এখনো পারি না। আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধান বা গম আমদানি না করলে আমাদের চলে না। মানুষ বা জন্তুর মেহনত ভিন্ন আমাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহারে ঘরে বাইরের সব কাজ সম্পন্ন হয়। কারখানার তো কথাই নেই, ক্ষেতে-খামারে, এমনকি গৃহস্থালির কাজেও দিন দিন যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। যন্ত্রের ব্যবহারে আমেরিকার আর্থিক উন্নতিও অসাধারণ—খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-আসাক, কাঁচামাল বা বিলাস-সামগ্রী সবই অফুরন্ত। ভারতবর্ষে আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় তিনশো টাকারও কম—আমেরিকায় বোধ হয় দশ হাজারেরও বেশী। বস্তুতপক্ষে এক মানুষ ছাড়া আমেরিকায় আর কোন জিনিসেরই অভাব নেই। আমাদের সমস্যা জনতার সংখ্যাধিক্য—বহুক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকেরও কাজ মেলে না, বেকার হয়ে বসে-থাকতে হয়—আমেরিকার সমস্যা যে কাজ করবার মতন যথেষ্ট লোক নেই, তাই বহুক্ষেত্রে মানুষ কাজ খোঁজে না, কাজ মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

পার্থক্যের ফিরিস্তি আরো বাড়ানো চলে। পৃথিবীর ধনীশ্রেষ্ঠ এবং দরিদ্রতম দেশের মধ্যে বহু বিষয়ে অন্তর থাকবে, তাতে বিচিত্র কি? কিন্তু

আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য যেমন রয়েছে, বহু বিষয়ে মিলও তেমনি সুস্পষ্ট। দুই দেশের লক্ষ্য এবং আদর্শে প্রথম দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও এক অন্তর্নিহিত গভীর ঐক্য রয়েছে। দুই দেশেরই আদর্শ সাম্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সকল মানুষের জন্য সুষ্ঠু সামাজিক জীবনের ব্যবস্থা। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, নানা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা সকল নাগরিককে সমান সুবিধা ও সুযোগ দান, সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা উপায়ে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই দেশেই জনকল্যাণ রাষ্ট্র-গঠনের চেষ্টা চলেছে। দুই দেশেই বিভিন্ন ও বিচিত্র সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও একীকরণের ভিত্তিতে এক নতুন সুসংবদ্ধ সমাজ-গঠনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। দুই দেশের মূল মানবিক আদর্শ এক, এবং দুই দেশেই প্রতিদিনের জীবনে আদর্শবিচ্যুতির কমবেশী নিদর্শন মেলে।

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই-ই বিরাট দেশ। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা ভারতবর্ষের চেয়েও আয়তনে বড়। ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করলে এ তফাত খুব সহজে ধরা পড়ে। ইয়োরোপে ঘণ্টাখানেক চললেই হাওয়াই জাহাজ একদেশ অতিক্রম করে অন্য দেশে পৌঁছে যায়। ভারতবর্ষে দিল্লী থেকে মাদ্রাজ যেতে সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে, আমেরিকায় নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো যেতেও দিন কেটে যায়—সারাদিন চলেও হাওয়াই জাহাজ দেশের সীমানা অতিক্রম করল না, ইয়োরোপে এ-রকম ঘটা সম্ভব নয়। রেলগাড়িতে বা মোটরে চললে আমেরিকা বা ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন আরো ভাল করে বোঝা যায়।

বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়াও ভিন্ন রকমের। ভারতবর্ষে যেমন হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চির-গ্রীষ্মের মৌসুমের পরিচয় মেলে, আমেরিকায়ও তেমনি কঠোর শীত এবং কঠিন গ্রীষ্মের প্রভাব সমান ভাবে উপলব্ধি হয়। দুই দেশেই পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল অধিত্যকা উপত্যকা সমভূমির অভাব নেই।

ভারতবর্ষের মতন আমেরিকার জনসংখ্যাও বিচিত্র। বহু বিভিন্ন জাতি, দেশ, ধর্ম ও ভাষার নানা সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে বর্তমানের মার্কিন জাতি গড়ে উঠেছে। এ দেশে যেমন আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হুন পাঠান মোগল প্রভৃতি নানা মানুষের বিচিত্র ধারার সমাবেশে ভারতীয় জাতিত্ব,

আমেরিকায়ও ঠিক সেই একই ইতিহাসের পরিচয় মেলে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাতির তো কথাই নেই—ইংরেজ ফরাসী জার্মান রুষ ইতালিয় ওলন্দাজ চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি যত স্যাক্সন টিউটন, ল্যাটিন বা স্লাভনিক জাতি রয়েছে, সবাই আমেরিকায় এসে ভিড় করেছে—এশিয়া আফ্রিকার বহু জাতিও আমেরিকার জনসমুদ্রে বিলীন বা বিলীয়মান হয়েছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে এ সমন্বয় ধীরে ধীরে সাধিত হয়েছে—আমেরিকায় সব জিনিসই তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন হয়। গত একশো বছরের মধ্যে আমেরিকায় নানা দেশের নানা ভাষার নানা ধর্মের লোক ভেঙে চুরে এক নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

আমেরিকার বিকাশের এই যে ইতিহাস, তার প্রভাবে মার্কিন নরনারীর চরিত্রে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণ কথাটি ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার করেছি, কারণ একদিক থেকে দেখলে তাদের গুণ মনে করা চলে, আবার দৃষ্টিভঙ্গীর একটু বদল হলে গুণ দোষে পরিণত হয়। আমেরিকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিস প্রথম নজরে পড়ে সেটি হল দেশবাসীর আশ্চর্য সহৃদয়তা ও আতিথ্য। পৃথিবীর সব দেশেই সাধারণ মানুষের মনে বিদেশীর প্রতি সহানুভূতি ও সম্প্রীতির পরিচয় মেলে। সব দেশেই জনসাধারণ বিদেশীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাহায্য করবার স্পৃহা বোধ হয় অন্য দেশের তুলনায় আরো বেশী প্রবল। এ সহৃদয়তার অন্যতম কারণ আমেরিকার বিকাশের ইতিহাস। প্রধানত ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেই আমেরিকায় ভিড় করেছে। স্বদেশে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়নি বলেই তারা দেশত্যাগী হয়েছিল। বহুক্ষেত্রেই কপর্দকহীন অবস্থায় তারা আমেরিকায় পৌঁছেচে, এবং খানিকটা নিজের পরিশ্রমে, খানিকটা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশী লোকের সাহায্যে অর্থ ও সামাজিক স্থিতি অর্জন করেছে। যারা নিজেরা দুঃখকষ্টে মানুষ, তারা সহজেই অন্যের দুঃখকষ্ট বুঝতে পারে। যারা বিদেশে বিভুঁয়ে একান্ত একাকী জীবনযাত্রা সুরু করেছে, তারা যে পরদেশীর প্রতি সহজেই সহানুভূতিশীল হবে, তাতে আশ্চর্য কি? শুধু তাই নয়। যে ভাবে প্রথম যুগে আমেরিকার সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাতে পরস্পরকে সাহায্য না করলে ধনৈশ্বর্য অর্জন তো দূরের কথা, বহু লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হ'ত।

সীমাসরহদ্দের লোকেরা চিরকালই অতিথিবৎসল এবং পরস্পরের সহায়ক হয়ে থাকে। তারা হয়তো ভব্যতা জানে না, কিন্তু তাদের হৃদ্যতা এবং দরদ সুস্পষ্ট। আমেরিকার জনসাধারণের চরিত্রেও এ দু'টি গুণের পরিচয় মেলে।

পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ পরস্পরের সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তারই ফলে সমাজ গড়ে ওঠে। সামাজিক মনোবৃত্তির একটি প্রধান প্রকাশ আতিথেয়তা। খোরাকের অভাব হলে অবশ্য মনের এ স্বাভাবিক স্পৃহা ক্ষুণ্ণ হয়ে আসে। আমাদের দেশে আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে জনসাধারণের আতিথেয়তার পরিবর্তন হচ্ছে, তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগেকার দিনে গ্রামে যখনই অতিথি অভ্যাগত আসত, তাদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হ'ত না। রাত দুপুরে কারো বাড়িতে উপস্থিত হলেও গৃহকর্তা অতিথি সৎকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। আজকাল শহরে একজনের জায়গায় দুইজন অতিরিক্ত লোকের খোরাক জোগাতে হলে গৃহস্বামী এবং বাড়ির কর্ত্রীর ভাবনার অন্ত থাকে না। তার কারণও স্পষ্ট। পূর্বে ধানচাল তরিতরকারীর ততটা অভাব ছিল না। বিশেষ করে গ্রামে সহজেই এ সব জিনিস মিলত। আজকাল শহরে সংসারের প্রয়োজনমত বরাদ্দ জিনিস ওজন করে কেনা হয়—তাই হঠাৎ বেশী খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হলে সে দাবী মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অভাবের সংসারে মানুষের হৃদয়ের প্রসারও কমে আসে। আমেরিকায় বেশীরভাগ লোক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে। তাই তাদের সমাজে অতিথি-সৎকারের রেওয়াজ আজও পুরোপুরি বজায় রয়েছে।

বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় সাধারণ লোকের সহৃদয়তা ও অতিথি-প্রীতি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাদের বাড়ির দরওয়াজা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত। পথে কারো সঙ্গে পরিচয় হল—হয়তো হাওয়াই জাহাজে বা ট্রেনে বা বাসে পাশাপাশি বসে কথার সুরু, এবং তারই ফলে পরিচয়। অথচ সেই অল্পক্ষণের পরিচয়ের ভিত্তিতেই তারা আগন্তুককে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসে, বিশেষ করে দূরাগত বিদেশী অভ্যাগতের জন্য তাদের আতিথেয়তার প্রকাশ আরো বেশী দরাজ, বলে, এসে দু'চার দিন আমাদের অতিথি হয়ে থেকে যাও। সে আমন্ত্রণ কেবল লোক দেখানো মৌখিক আমন্ত্রণ নয়। গ্রহণ না করলে অনেক সময় তারা ক্ষুণ্ণ হয়। নিজে অথবা নিজের পূর্বপুরুষ বিদেশে

এসে প্রথম যে অপরিচয় ও অসহায়তা বোধ করেছে, বিদেশী দেখলে যেন তারই স্মৃতি আমেরিকাবাসীর মনে জাগে। অপরের সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলে সেই প্রথম সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে যে ভাবে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজ বিদেশীর প্রতি সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রসারিত করে তারা যেন সেই পূর্বঋণ শোধ করতে চায়।

মার্কিনবাসীর সহৃদয়তা ও অতিথিপ্রীতি ছাড়া আরও একটি গুণ সহজেই বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিনসমাজে ছোটবড়র তফাত যে ভাবে মুছে গিয়েছে, তা সত্যি বিস্ময়কর। সামাজিক সাম্য এবং গণতন্ত্র বোধ হয় আর কোথাও এত প্রবল ভাবে দেখা দেয়নি। সব রকমের মেহনতের মর্যাদাও অন্য কোথাও এত স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। ব্যাঙ্কের বা কারখানার ম্যানেজার হয়তো মাসে দশ পনেরো হাজার টাকা রোজগার করে, কারখানার মজুরের অথবা বাড়ির চাকরানীর আয় হয়তো মাসে পনেরোশো বা দুহাজার টাকা, কিন্তু তাই বলে ম্যানেজার মজুর বা চাকরানীর উপর তম্বি করে না। বোধ হয় করতে সাহস পায় না। পৃথিবীর নানা দেশের লোক নানা রকমের সভ্যতা আচারবিচার নিয়ে আমেরিকায় ভিড় করেছে বলে বিশেষ কোন সভ্যতা আচারবিচারের প্রতি তাদের মোহ কম। প্রথম অবস্থায় যখন বন-জঙ্গল সাফ করে পাহাড় পর্বত কেটে তারা গ্রাম জনপদ শহরের পত্তন করেছে, তখন শ্রমবিভাগের কথা কেউ ভাবেনি, ভাবা সম্ভব ছিল না। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সামনে যখন যে-কাজ এসেছে তাই করেছে, এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি বা ব্যবসায়ের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আপনা আপনি লোপ পেয়েছে।

বিরাট দেশ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য এবং কাজের পরিমাণে লোকসংখ্যা কম বলেও মার্কিন দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তির মর্যাদার এত বিকাশ। পৃথিবীর অন্য প্রায় সব দেশেই কাজের তুলনায় উমেদার বেশী, তাই প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ সবাইকে রুজীর ভাবনা ভাবতে হয়, কাজের ধান্দায় ঘুরতে ফিরতে হয়। মার্কিন দেশে কাজের তুলনায় লোকসংখ্যা কম বলে সেখানে মানুষ কাজ খুঁজে বেড়ায় না—বহুক্ষেত্রে কাজই মানুষের অপেক্ষায় বন্ধ হয়ে থাকে। মার্কিন ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই মোটামুটি ভাবে এ কথা সত্য। মাঝে দুয়েকবার ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দার দরুণ বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু

পূর্বে বেকার হলেই লোকে পশ্চিমযাত্রা করত, এবং সীমান্তদেশের অনাবাদী জায়গায় বনজঙ্গল কেটে নতুন গ্রাম জনপদের পত্তন করত। এমনি করে যখন মার্কিন দেশের লোক প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে পৌঁছল, তখন তাদের পশ্চিমের অভিযান বন্ধ হল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও টেকনিকের নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে নতুন ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠতে স্বরু করল। মার্কিন দেশে যে পৃথিবীর অন্য সব দেশের তুলনায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশী, কাজের তুলনায় লোকের অভাব তার অন্যতম কারণ।

লোকসংখ্যার অভাব বলে একদিকে যেমন যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধও প্রবল হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষকে সেধে কাজে লাগাতে হয়, সেখানে যে কৃষিজীবী মজুর সকলেই নিজেদের দাবী বাড়িয়ে তুলবে, তাতে বিচিত্র কি? পূর্বেই বলেছি যে বাড়ির চাকরানীও মাসে হয়তো পনেরোশো ত্ব'হাজার টাকা রোজগার করে, তার চেয়ে কম রুজী বোধ হয় কারোই নেই। একথা হয়তো খানিকটা আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু আমেরিকায় সর্বোচ্চ বেতনের তুলনায় সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত ভারতবর্ষ বা রুষদেশের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী বা ব্যবসায়ীর আয় সর্বনিম্ন কর্মচারীর আশী গুণ বা একশো গুণ, সাম্যবাদী রুষদেশেও এ অন্তর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গুণ, কিন্তু ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় আয়ের পার্থক্য পনেরো বিশগুণের বেশী নয়। সকল ধরনের রুজীতেই খোরাক পোশাকের সচ্ছল ব্যবস্থা হয় বলে কারো মনে বৃত্তি বা ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন হীনতাবোধ নেই। বাড়ির চাকরাণী সেজেগুজে বিউইক গাড়ি চালিয়ে কাজ করতে আসে, বাড়িতে পৌঁছে কাজের পোশাক পরে ত্ব'তিন ঘণ্টা কাজ করে আবার পোশাক বদল করে বিউইক গাড়ি হাঁকিয়ে ফিরে যায়। কাজের সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়ে মনিব চাকর চাকরানীর কোন তফাত থাকে না। রাস্তাঘাটে হোটেলে থিয়েটারে সাজ-পোশাক বা চাল চলন দেখে কারো বলার সাধ্য নেই যে কে মনিব আর কে চাকরানী। সকলেই প্রায় একই ধরনের লেখাপড়া শেখে বলে সামাজিক সাম্যবোধ আরো প্রবল হয়ে উঠে।

পৃথিবীর আর কোন দেশেই বোধ হয় এত বেশী সামাজিক সাম্যবোধ দেখা যায় না। মানুষে মানুষে প্রায় সমস্ত পার্থক্যই মার্কিন দেশে দূর হয়ে

গিয়েছে। কেবল বর্ণবৈষম্যের বেলা তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিগ্রো আমেরিকানদের প্রতি মার্কিন দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে যে অনাদর ও অবহেলা, মার্কিন গণতন্ত্রের পক্ষে এতবড় কলঙ্কের কথা আর কিছুই নেই। দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোদের জন্য থাকবার জায়গা আলাদা, খাবার ব্যবস্থা আলাদা, স্কুল হাসপাতাল আলাদা, রেলগাড়িতে পৃথক আসন। এমনকি রেল-স্টেশনের আসা-যাওয়ার দরজাও আলাদা। এক কল থেকে তারা জল খেতে পায় না, ধর্মানুষ্ঠানের জন্য গির্জা আলাদা, এমনকি মৃত্যুর পরেও আলাদা কবরস্থান। এ সম্বন্ধে দক্ষিণ অঞ্চলের বহু শ্বেত আমেরিকানের মনে কোন দ্বিধা পর্যন্ত নেই। এটাও খুবই বিচিত্র লাগে যে পূর্বপুরুষদের মধ্যে পারশিক, আরবী, ভারতীয়, চীনা, জাপানী, দক্ষিণ আমেরিকান বা আমেরিকার আদিবাসী হলে মার্কিন নাগরিকের মনে সে জন্য কোন খেদ থাকে না, বরং বহুক্ষেত্রে বেশ খানিকটা গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে সে কথা জাহির করে, কিন্তু যদি কোনক্রমে কোথাও বিন্দুমাত্র নিগ্রোরক্তের ছোঁয়াচের সন্দেহ থাকে, তবে সে বিষয় একেবারে চেপে যায়। বস্তুতপক্ষে নিগ্রোরক্তের সম্পর্কের চেয়ে মার্কিনবাসীর পক্ষে গুরুতর অপমান আর কিছুই নেই। প্রকৃতি কিন্তু এ মনোভাবের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও দিনে দিনে জমিয়ে তুলছে। প্রায় তিন শতাব্দী একত্র বসবাসের ফলে ইয়োরোপিয় পুরুষের ঔরসজাত নিগ্রো-রমণীর সন্তানের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে অনেকের আকৃতি প্রকৃতি চেহারায় পুরোপুরি ভাবে পিতৃবংশের প্রভাব বিদ্যমান, বহুক্ষেত্রে নিগ্রোরক্তের কোন বহির্লক্ষণের পরিচয় মেলে না। সমাজ-বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই আজ এ-কথা মেনে নিয়েছেন যে প্রতি বৎসর নিগ্রোবংশোদ্ভূত এই ধরনের প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী বর্ণরেখা অতিক্রম করে শ্বেত আমেরিকানদের মধ্যে বিলীন হয়। ষোলো কোটি লোকসংখ্যায় ত্রিশ হাজার অবশ্য খুবই সামান্য অনুপাত, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এ ভাবে নিগ্রোরক্ত যদি শ্বেত আমেরিকানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তবে একদিন এমন সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তির পক্ষেই অবিমিশ্র শ্বেতরক্তের গর্ব করা সম্ভব হবে না।

ঐতিহাসিক পরম্পরার ফলেই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে শ্বেতসম্প্রদায়ের মধ্যে নিগ্রো-বিদ্বেষের প্রথম প্রকাশ। কারো প্রতি অন্যায় করলে অন্যায়কারী

স্বভাবতই নিজের কার্যকলাপের জন্য অজুহাত খোঁজে, এবং ফলে নিপীড়িতের প্রতি অনুকম্পা বা সহানুভূতির বদলে বহুক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও বিরাগের পরিচয় মেলে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার শ্বেতসম্প্রদায় আফ্রিকার নিরীহ ও অসহায় নরনারীকে গৃহচ্যুত করেছে, দাসত্বে নিপীড়িত করেছে, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের মানুষেতর প্রাণী গণ্য করেছে। আমেরিকা যেদিন স্বাধীন হল, সর্বমানবের সাম্য ও ঐক্যের ঘোষণাবাণী প্রচারিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের নতুন যুগ প্রতিষ্ঠা করল, সেদিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা নিগ্রোসমস্যার কথা ভোলেননি। তখনো সময় হয়নি বলে স্পষ্ট ভাবে নিগ্রোদের স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা তাঁরা বলেননি বটে, কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী এমন ভাবে রচনা করেছিলেন যে তার পরিপূর্ণ প্রকাশে নিগ্রোদের প্রতি অন্যায় দূর হতে বাধ্য।

বস্তুতপক্ষে মার্কিন দেশে যাঁরা চিন্তাশীল ও উদারপ্রাণ, নিগ্রোসমস্যা নিয়ে তাঁদের মনে লজ্জা ও ক্ষোভের অন্ত নেই। লিঙ্কনের নাম আমেরিকার সমস্ত প্রেসিডেন্টদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত, এবং তার একটি প্রধান কারণ যে দক্ষিণ অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা লোপ করে তিনি নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন। প্রথম যখন এ সমস্যার উদয় হয়, তখন সম-অধিকারের কথা তিনি ভাবেননি, কিন্তু একবার সমস্যা সমাধানে অবতীর্ণ হয়ে তিনি দেখেছিলেন যে জাতির যে কোন অংশকে অপমানের অর্থ সমস্ত জাতির অপমান, দেশের কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে দুর্বল রাখার অর্থ সমস্ত দেশের শক্তিহানি। আজো নিগ্রোজাতির অধিকার সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু গত বিশ বৎসরে, এবং বিশেষ করে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ শেষে আমেরিকার নিগ্রোসম্প্রদায় যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার সমাজ জীবনের এ কলঙ্ক দূর হয়ে যাবে। আজ দু'বছর হল আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত করেছে, তার ফলে শিক্ষায়তনে বর্ণবিভেদের গ্লানি দূর হতে বাধ্য। যদি শৈশব থেকে শ্বেত অশ্বেত নিগ্রো অনিগ্রো বালক বালিকা স্কুলে কলেজে একই আবহাওয়ায় মানুষ হয়, তবে কালক্রমে বর্ণবিদ্বেষ ও বর্ণবিভাগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এ আশা অন্যায় নয়।

মার্কিন দেশের নরনারীর চরিত্রের আর একটা লক্ষণও সহজেই বিদেশীর

চোখে ধরা পড়ে। মার্কিনবাসী কোন জিনিসই বেশীদিন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় না। তারা ঘর-বাড়ি সহজে বদল করে, পোশাক-আসাক তো অনবরত বদলায়, সামাজিক ব্যবস্থা বা রীতি-নীতি বদলাতেও তাদের বিশেষ আপত্তি নেই। মার্কিনবাসীর এ পরিবর্তনশীলতাও মার্কিন ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। বেশীর ভাগ মার্কিনবাসী বিদেশাগত। আমেরিকায় কারো এক পুরুষ, কারো দু'পুরুষ তিন পুরুষ বড়জোর কারো চার পাঁচ পুরুষ কেটেছে। এক পূর্বাঞ্চলে নিউ ইংলণ্ড বা নয়া ইংলণ্ড বাদ দিলে বাকী সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসতির পত্তন হয়েছে গত একশো বছরে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির যে সব মানুষ আমেরিকার প্রবল টানে দেশত্যাগী হয়ে বেরিয়ে এল, তাদের প্রায় সকলেই সমাজবিদ্রোহী। নিজেদের সমাজের প্রতি তাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। বহুক্ষেত্রে বিরাগ ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমেরিকায় এসে এইসব বিভিন্ন সমাজের বিদ্রোহী এবং অসন্তুষ্ট জনপ্রবাহ এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মিলনের ফলে কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার বন্ধন দিনে দিনে আরো শিথিল হয়ে পড়ল। ইতালিয় রোমান ক্যাথলিক পিতামহ, রুষ সনাতনপন্থী পিতামহী প্রটেষ্টাণ্ট ইংরেজ মাতামহ ও স্প্যানিশ ক্যাথলিক বা জার্মান ইহুদী মাতামহীর পৌত্র-প্রপৌত্র যে কোন বিশেষ ধর্ম বা জাতির জন্য বিশেষ অনুরাগ অনুভব করবে না তাতে বিচিত্র কি ? এ পাঁচমিশেলীর ফলে স্থাবর বা শাশ্বত জাতীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠা অসম্ভব, এবং নিত্য নূতন পরীক্ষার প্রতি আগ্রহবান হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকার ইতিহাসে যেভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, তার ফলেও মার্কিনবাসীর মনে নতুনের প্রতি আগ্রহ প্রবলতর ভাবে দেখা দিয়েছে।

আমেরিকার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যে বিরাট সম্ভাবনা, তার প্রতিক্রিয়ায়ও মার্কিনবাসী নতুনের উপাসক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় কেউই বর্তমান নিয়ে তুষ্ট নয়—প্রত্যেকেই ভাবে যে অদূর ভবিষ্যতে সকল-ভাবে তার উন্নতি হবেই। চাষীর ছেলে রাষ্ট্রপতি হয়েছে, মজুরের ছেলে কালক্রমে মিলের মালিক, বাড়ির চাকরানী ভাবে যে সে-ও একদিন চিত্র-তারকা হয়ে যশ ও অর্থের উচ্চতম শিখরে উঠবে। কাজেই বর্তমানের আয়ত্ত জিনিসের প্রতি মার্কিনবাসীর মোহ নেই, অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়

তাঁর সমস্ত চিত্ত উন্মুখ। মার্কিন মনোবৃত্তির এ বিশেষ প্রকাশ আজ একশো বছরেরও আগে দ্য তকভিল লক্ষ্য করেছিলেন। মার্কিন জাহাজ তেমন মজবুত নয় দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করায় জাহাজী উত্তর দিল যে বেশী মজবুত জাহাজ তৈরী করে কি লাভ? দশ বৎসরের মধ্যে জাহাজ নির্মাণের যে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে, তার ফলে এ ধরনের জাহাজ অচল হয়ে যাবে, কাজেই দশ বছর চলে, তার চেয়ে বেশী মজবুত জাহাজ তৈরীর কোন সার্থকতা নেই! একশো বছর আগে জাহাজের খালাসী যে উত্তর তকভিলকে দিয়েছিল, আজো তাই মার্কিনবাসীর অন্তরের কথা। ইংরেজ রোলসরয়েস গাড়ি তৈরী করে, পঞ্চাশ বছরেও তার দেহ, তার এঞ্জিন খারাপ হয় না। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম গাড়িও পাঁচ সাত বছরের বেশী টেকে না—টেকবার জন্য তৈরী হয়নি। বছর বছর গাড়ি বদলের রেওয়াজ হেনরী ফোর্ডের নতুন অবদান নয়—ফোর্ডের কৃতিত্ব এই যে মার্কিন মনোভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তার অভিলাষ পূরণের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেছিলেন।

শ্রাবণ ১৩৬৩

॥ দুই ॥

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সাম্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। নিগ্রোসম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারের প্রসঙ্গ বাদ দিলে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় সামাজিক সাম্যের এত স্পষ্ট ও ব্যাপক নিদর্শন মিলবে না। আমেরিকার ইতিহাস এ সাম্যবাদী মনোভাবের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। নানাদেশের নানাজাতির বিদ্রোহীরা এসে এখানে ভিড় করেছিল বলে সকল রকমের সামাজিক স্তরভেদের বিরুদ্ধে আক্রোশ আমেরিকাবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য তার রকম বেরকম প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রতিক্রিয়ার পরিণতি হাস্যকর। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়েই আমেরিকাবাসী সজোরে এবং সগর্বে ঘোষণা করেছিল যে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকবে না, রাজতন্ত্র বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু আমেরিকানের মনে অভিজাতশ্রেণীর প্রতি গোপন অনুরাগ নানাভাবে ধরা দেয়। এককালে ইয়োরোপের বিত্তহীন অভিজাতশ্রেণীর পুরুষেরা লুপ্ত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের জন্য আমেরিকা যাত্রা করত। সে যাত্রা ব্যবসায় বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। বর্তমান যুগে সামরিক অভিযানের অবকাশ ত নেই বললেই চলে। আমেরিকাবাসী ধনী কন্যাকে বিবাহ করে ঐশ্বর্য সংগ্রহের সাধনায় ইয়োরোপীয় বিত্তহীন অভিজাতের এ অভিযান বহুক্ষেত্রে কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবাধ সংমিশ্রণ ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের বহু জাতি দেশ ও সভ্যতার সমাবেশ ও সহযোগের পরিচয়ও আমেরিকায় মিলবে। তিনশ' বছর আগে সে ইতিহাসের সুরু কিন্তু তার গতি ও পরিমাণ গত একশ' বছরের মধ্যে যে ভাবে বেড়ে চলেছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। এত রকম পাঁচমিশেলী সত্ত্বেও যে একটি বিশেষ আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গী ও আমেরিকান জাতি গড়ে উঠেছে, তার কারণ খুঁজতে গেলে যে সমস্ত শক্তি ও প্রভাবের পরিচয় মেলে,

আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীকে তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। তাই আমেরিকার বিষয়ে কোন কথা বলতে চাইলেই আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের খাতিরেও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। আজকাল সবাই মেনে নেয় যে জনসাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বর্তমানে আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তাই এ কথা বললে হয়'ত আশ্চর্য শোনাবে যে ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আমেরিকার পূর্বে কোন দেশেই হয়নি। পুরাকালে কোন দেশেই সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়নি। অধিকারভেদের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা মুষ্টিমেয় লোকেই পেয়েছে। অধিকারভেদের ভিত্তি নিয়েও অনেক কথা বলা চলে। ব্যক্তিগত শক্তি বা গুণের বদলে বংশমর্যাদা দিয়েই সাধারণত অধিকার নির্ণয় হ'ত। ক্বচিৎ দু'এক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম মিলবে, কিন্তু অধিকাংশের বেলায়ই কৌলিকবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন ব্যক্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। তারই ফলে ভারতবর্ষে জাতিভেদের পত্তন। গুণগত পার্থক্যের বদলে বংশগত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের মূল্যবিচারে ভারতীয় সমাজের অবনতিও তাই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরাকালে বিদ্যার্জন সর্বসাধারণের পক্ষে দুর্লভ ছিল। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জ্ঞানভাণ্ডারকে যক্ষের ধনের মতন আঁকড়ে পড়ে থাকত—নিজেদের গোষ্ঠি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বাইরে যাতে সে জ্ঞান ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এক বিশেষ শ্রেণী জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করবে, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবিভাগ যে রকম স্পষ্ট এবং দৃঢ়, সর্বত্র তার পরিচয় না মিললেও এ শ্রেণীবিভাগের মূলতত্ত্ব প্রাচীনকালের প্রায় সকল দেশে ও সমাজেই মিলবে। সমাজের কার্যকলাপের তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ সে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিজের নিজের বংশগত বা কৌলিক কর্তব্যপালন বিধাতার বিধান বলে মেনে নিয়েছে। সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার ঘোষণা

বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের অন্যতম দান। ইসলামই প্রথম বলে যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষাদান সমাজের কর্তব্য। এবিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরে এ নির্দেশ আর কার্যকরী রইল না। তাই মধ্যযুগেও সর্বসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থার বদলে কৌলিক বৃত্তির ভিত্তিতে শিক্ষাদানের ধারা চলে এসেছে। এখানে-ওখানে খানিক অদল-বদল সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

এই চিরাচরিত ধারাকে অস্বীকার করেই আমেরিকার বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। তাই সে বিপ্লবে রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে বংশগত মর্যাদা ও কৌলিন্যকে অস্বীকার করবার প্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদের যাঁরা পত্তন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও ধনী, তাঁদের অভিজাত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁরা এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের সমানাধিকারকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করলে আমেরিকার বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাঙলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা দেখি যে দিল্লীর প্রভুত্বকে অস্বীকার করার জন্য পাঠান সুলতানেরা মনেপ্রাণে বাঙালী বনে গিয়েছিলেন—অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবার জন্য আমেরিকাবাসী অভিজাত নিজের আভিজাত্যকে অগ্রাহ্য করে মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সকলের সমানাধিকার থাকবে এই স্বীকৃতির মধ্যেই আমেরিকার ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালী ও আদর্শের সন্ধান মিলবে। প্রথম দিন থেকেই তাই আমেরিকার রাষ্ট্রনেতারা মেনে নিয়েছিলেন যে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য।

আদর্শ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই এ আদর্শকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু স্বীকৃতির ফলে সর্বসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছিলেন যে শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা না হলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলতে পারে না। জেফারসন তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবার উদ্যোগের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিরাট দেশে জনসংখ্যার স্বল্পতার ফলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। অল্প লোকের দ্বারা অনেক কাজ করাবার চেষ্টায় নানা ধরনের

যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমেরিকায় যন্ত্র-সভ্যতার যে উৎকর্ষ, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। যন্ত্রকে চালাতে হলে যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য, এবং সাধারণ শিক্ষার অভাবে যান্ত্রিক পারদর্শিতা বা কৌশল আসতে পারে না। আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতার উৎকর্ষের প্রয়োজনেও তাই শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। এবং প্রথম থেকেই সবাই মেনে নিয়েছে যে ব্যক্তি বা সমাজে প্রগতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আমেরিকায় তাই সর্বপ্রথম সার্বিক শিক্ষার প্রচলন হয়। গোড়ায় আমেরিকান নাগরিক চার পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেত, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও পরিমাণ দুই-ই বেড়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক বালকবালিকাকেই বাধ্যতা-মূলকভাবে ষোল বৎসর বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হয়। এবং আজ দাবী উঠেছে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত করতে হবে। ষোল বৎসর পর্যন্ত স্কুলে থাকার অর্থ যে প্রত্যেক বালক-বালিকা অন্তত দশ বৎসর শিক্ষালাভ করে, আঠারো বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারিত হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বারো বৎসর হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষার এ রকম ব্যাপক ব্যবস্থা নেই। বিলাতে পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ রয়েছে, রুষ দেশে এখনো সে মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু অল্পদিন হল সোভিয়েট রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করেছে যে ১৯৬০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে সতেরো বৎসর পর্যন্ত করা হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকায়ও টনক নড়েছে, এবং কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত না হলেও অন্তত আঠারো বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রচলনের দাবী প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাঁধাধরা শিক্ষা সুরু হয় ছয় বা সাত বৎসর বয়সে, কিন্তু তার আগেও শিশুদের নানা ধরনের মনোরঞ্জন ও মনোবিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। কিণ্ডারগার্টেন ত রয়েছেই, তা ছাড়াও বহু স্থানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন বৃত্তির পূর্ণ পরিণতির

জন্য খোলাধূলা এবং একক বা সমবেত নানা ক্রিয়াপদ্ধতির আয়োজনের প্রভাব নেই। ভবিষ্যৎ নাগরিকের পূর্ণবিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা সমাজের সর্বপ্রথম কর্তব্য, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নেই। ছোট ছোট শহর গ্রামগুলিতেও প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দালান কোঠা আসবাবপত্র সব এত পরিপাটি যে বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশের কলেজেও তার তুলনা মেলে না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সর্বব্যাপী করে আমেরিকা তুষ্ট হয়নি, তাকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ এবং সার্থক করবার জন্যেও চেষ্টার অন্ত নেই। শিক্ষার উৎকর্ষ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে, তাই শিক্ষকের কৃতিত্ব সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতির দিকেও আমেরিকা দৃষ্টি দিয়েছে। গত আট দশ বৎসরে শিক্ষকের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তবু এ কথা মানতে হবে যে আমেরিকার সমাজে শিক্ষকের এখনো স্বকীয় মর্যাদা মেলেনি। কেবল আমেরিকা বলে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিক্ষকের অর্থনৈতিক সংস্থান ভাবনার বিষয়। বহুক্ষেত্রে মোটা মেহনতের কাজের মজুরের যে আয়, প্রাথমিক শিক্ষককে তাই নিয়ে দিন যাপন করতে হয়। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় শিক্ষকের সংখ্যাল্পতার সমস্যা দেখা দিয়েছে, এবং তার সুযোগ নিয়ে সমাজের দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ শিক্ষকের আর্থিক অনটন দূর করবার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকার বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাও প্রায় সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে স্কুলে যেতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কিশোর কিশোরীই আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পাঠক্রম বজায় রাখে। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। নানা দেশের যে সকল নরনারী আমেরিকায় অভিযাত্রী হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই স্বদেশে শিক্ষার সুযোগ পাননি। প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত না হলেও তাঁরা সাহসে বুদ্ধিতে এবং বহুক্ষেত্রে চরিত্রেও বিশিষ্ট—তা না হলে স্বদেশের পরিচিত পরিবেশ পরিত্যাগ করে বিদেশ বিভুঁয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় নামতেন না। আমেরিকায় এসে তাঁরা নিজের শক্তিতে নিজের ভাগ্য নির্মাণ করেছেন, তাই তাঁরা যে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে সকল রকম শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেবেন, তাতে বিচিত্র কি? আমেরিকার সমাজসংগঠনে যে

বৈশিষ্ট্য, তার ফলে শিক্ষার জন্য আগ্রহ আরো প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার সামাজিক সাম্যের কথা আগেও বলেছি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে সাম্য আরো সজীব হয়ে উঠেছে। সমাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে পৌছবার উপায় হিসাবে শিক্ষা আমেরিকায় যে ভাবে কার্যকরী, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার দু'টি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এককালে শিক্ষার অর্থ ছিল লেখা পড়া আঁক কষা। এক কথায় পুঁথি-সর্বস্ব বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষাকেই শিক্ষা মনে করা হত। যতদিন সমাজের এক নগণ্য অংশ শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল, ততদিন এ ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা যখন প্রথম সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দিল তখনও এ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ছিল মোটে চার পাঁচ বৎসর, এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি-ভাবে লেখাপড়া আঁক কষা ভিন্ন অন্য কিছু শেখা সম্ভব হত না। তা ছাড়া শৈশবে বালকবালিকাদের স্পৃহা, রুচি বা শক্তির বিশেষ কোন তারতম্য বোঝা যায় না। দশ এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকাই একই ধরনের শিক্ষা লাভ করলেও তাই কোন ক্ষতি নাই। এগারো বারো বছর বয়সের পরে কিন্তু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে সুরু করে। বাধ্যতামূলক এবং ব্যাপক শিক্ষার মেয়াদ যখন চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়স ছাড়িয়ে সতেরো আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, তখন বিভিন্ন ধরনের রুচি ও স্পৃহা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার তারতম্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পুরাকালে এ সমস্যা কোনদিন প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ যে মুষ্টিমেয় কিশোর কিশোরী প্রাথমিক শিক্ষার দরজা অতিক্রম করে মাধ্যমিক বা উচ্চ-শিক্ষার স্তরে পৌছত, বুদ্ধিপ্রধান পুঁথিনির্ভর শিক্ষা তাদের রুচি ও স্পৃহার উপযোগী বলে তারা সহজেই সে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম কিশোর কিশোরীরা বহুল সংখ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রণী হয়। বর্তমানে বোধহয় শতকরা আশীজন কিশোর কিশোরীই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, কিন্তু এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতিও বদলেছে। পুরাকালের পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার বদলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা মানব-চরিত্রের সমস্ত রুচি ও শক্তিকে বিকশিত

করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রমের অবতারণা করেছে। ফলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা যে রকম বিচিত্র ও বহুমুখী, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কোনকালে অথবা বর্তমানে অন্য কোথাও তার নজীর মেলে না। শিক্ষার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা আমেরিকায় যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্তের ফলে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচিত্র ও বহুমুখী করবার প্রয়াস স্পষ্ট।

ভারতবর্ষে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কারের দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে। যাঁরা এ দাবী তুলেছেন, তাঁদের প্রধান বক্তব্য যে প্রত্যেক মানুষের রুচি বা শক্তি অনুযায়ী তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিলে তবেই সমাজ অধিক লাভবান হবে। কিশোর বয়সেই এ সমস্ত পার্থক্য প্রথম দেখা দেয়। তাই শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষা একধর্মী হলেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে। আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বব্যাপী হবার ফলেই প্রথম এ দাবী উঠেছিল, এবং বর্তমানে প্রায় সমস্ত পৃথিবীই সে দাবী মেনে নিয়েছে।

শিক্ষাকে বহুমুখী করবার দাবী যে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার মানকে অবনত করেছে, সে কথাও মানতে হবে। নানান ধরনের রুচি ও স্পৃহার তুষ্টিসাধনের চেষ্টায় অনেক অনুপযোগী বিষয়েরও শিক্ষাক্ষেত্রে আমদানি হয়েছে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলা হয় যে আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলে রেকাবী বাসন ধোয়ার ক্লাশও খোলা হয়েছে, এবং তার জন্যও হয়তো ডিগ্রী দেওয়া হবে। হাসি ঠাট্টার কথা ছেড়ে দিলেও এ কথা মানতে হবে যে মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের দাবী মেটাবার বিভিন্ন উপাদান শিক্ষার বিষয় হিসাবে সমান উপযোগী নয়। পূর্বে এ বিষয়ে উন্নাসিকতা এবং সঙ্কীর্ণতার বাড়াবাড়ি ছিল, এক মানসিক উৎকর্ষের উপকরণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে কোন বিষয়কে শিক্ষণীয় মনে করা হয়নি। ফলে গণিত, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি একান্তভাবে বুদ্ধিনির্ভর বিষয়ের মধ্যেই পাঠক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে যে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, তারও স্বীকৃতি এ সনাতনী শিক্ষা-দর্শনে মেলে না। বস্তুতপক্ষে বহুযুগ পর্যন্ত দর্শনের ছায়াছত্রতলে বিজ্ঞানের একটু সঙ্কুচিত স্থান মিলেছে, এবং এখনো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দর্শন হিসাবেই বিজ্ঞানের পরিচয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি খানিকটা অবজ্ঞার মনোভাবের পরিচয় আজও মেলে। কৃষিবিজ্ঞান বা পশুপালনতত্ত্ব সত্যিকার পাঠ্যবিষয় হতে পারে কিনা, তা নিয়ে আজও মাঝে মাঝে তর্ক ওঠে। কিন্তু আমেরিকায় এ সমস্ত বিষয় অধ্যয়নের ফলে সে দেশের যে আর্থিক ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি, তার ফলে আজ আর কেউ সরাসরিভাবে এ সমস্ত বিষয়কে অগ্রাহ্য করতে পারে না। দু'টি কারণে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার এ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। যতদিন সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষী ছিল, ততদিন সে শিক্ষা দর্শন-ঘেঁষা বলে কেউ আপত্তি করেনি। আমেরিকায় সে শিক্ষা প্রথম সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয়, এবং তার ফলে বিচিত্র রুচি ও শক্তির অধিকারী লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীর শক্তি সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের দাবী প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অন্যদেশে হয়ত সে দাবী এত সহজে গৃহীত হত না, কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের ফলে নতুনকে গ্রহণ করতে আমেরিকাবাসী কখনো দ্বিধা করেনি। পূর্বেও বলেছি যে যারা এসে আমেরিকায় নতুন সমাজ পত্তন করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে এসেছিল। যারা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ করেনি, তাদের মনেও প্রচলিত সমাজ বা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য ও আদর্শের উত্তরাধিকারী বহু মানবের একত্র সমাবেশে কোন বিশেষ দেশের ঐতিহ্য বা আদর্শের বন্ধন স্বভাবতই শ্লথ হয়ে এসেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ এবং নানা ধরনের রুচি ও দাবী মেটাবার প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তাই আমেরিকায় অতি সহজেই সাধিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্প্রসারণকে পৃথিবীর শিক্ষাতত্ত্বে আমেরিকার বিশেষ অবদান বলা চলে। বস্তুতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এত পাঁচমিশেলী আর কোথাও দেখা যায় না। রান্নাবান্না, সেলাই, কাপড়তৈরী—এককথায় ঘরকরনার সমস্ত কাজ শেখবার ব্যবস্থা স্কুলেই হয়। ক্ষৌরকর্ম, কাঠের কাজ, কামার কুমোরের কাজও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়। কৃষিকাজ বা

গৃহপালিত পশুপাখীর দেখাশোনাও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে কোন কোন স্কুলে মোটর চালানো শেখানো হচ্ছে। এক কথায় ঘরে বা বাইরে করণীয় সকলরকম কাজেরই হাতেখড়ি শিক্ষায়তনে হয়। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্যুত নয়—প্রতিপদে জীবনের কাজের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ।

এ ব্যবস্থার ফলে নানারকমে আমেরিকার সমাজ লাভবান হয়েছে। শিক্ষায়তনে যদি সকল রকমের কাজ এক সাথে শেখানো হয়, তবে কোন বিশেষ বৃত্তির প্রতি বিরাগ বা অবজ্ঞার মনোভাব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা স্বভাবতই কমে যায়। আমেরিকায় শ্রম ও শ্রমিকের যে ইজ্জত, মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমের ফলে তা' সমস্ত সমাজে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই যে পৃথিবীর নানা-দেশের নানা ভাষাভাষী নানাজাতির বংশধরেরা একপুরুষে পুরোপুরি আমেরিকান বনে যায়, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেশের যে সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসে, তারা নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় খুঁজে পায়। ভাষাপ্রধান পাঠক্রমে বিদেশাগত ছাত্রছাত্রীর যে অসুবিধা, নানাধরনের কর্মপ্রধান পাঠক্রমে তা' হয় না। ভাষা ভাল করে না জানলেও কাঠের কাজ বা লোহার কাজ বা সেলাই রান্না বিদেশাগত ছাত্রছাত্রী সহজেই শিখতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের আবহাওয়ায় ক্লাসে এবং বাইরে ইংরিজি ভাষার ব্যবহার সব সময়েই তারা শিখতে থাকে, এবং ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হবার আগেই তারা মনেপ্রাণে আমেরিকান হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে দেখা গিয়েছে যে বিদেশাগত আমেরিকানদের প্রথম পুরুষ ইংরিজি ভাষা সম্বন্ধে খানিকটা দুর্বল এবং স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি খানিকটা অনুরাগী থাকলেও দ্বিতীয় পুরুষে তাদের ছেলেমেয়েরা অত্যুগ্রভাবে আমেরিকান হতে চায়, পিতৃপুরুষের দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অবজ্ঞা কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিকভাবে প্রকাশ পায়। তৃতীয় চতুর্থ পুরুষে সে উগ্রতা আবার কমে আসে, এবং তখন পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি নতুন অনুরাগ দেখা দেয়। এতে আশ্চর্য হবার কারণ নাই। যতদিন জাতীয়তা সম্বন্ধে নিজেদের বা অপরের মনে কোন সন্দেহ থাকে, তারা যে আমেরিকান সে কথা জোর করে জাহির করবার

ততদিনই প্রয়োজন থাকে। সে সন্দেহ নিরসন হলে এবিষয়ে বাড়াবাড়িও কমে যায়।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালী জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান উপায় এ কথা মেনে নিয়েও কিন্তু আমেরিকার শিক্ষাবিজ্ঞানীরা তার সমালোচনায় পঞ্চমুখ। তাঁদেব মতে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাধারার গলদের ফলেই আমেবিকাব জীবনে বহু গ্লানি দেখা দিয়েছে। আমেবিকায় শিক্ষার মান কমে গিয়েছে এবং এখনো কমছে। একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে আমেবিকাব সাধাবণ ছাত্রছাত্রীবা যতখানি শেখে, জানে এবং বোঝে, বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকেব মতে ইযোবোপেব ছেলেমেয়েবা মাধ্যমিক স্কুল শেষ কববাব আগেই তা আয়ত্ত কবে। বতমানে আমেবিকাব সমাজজীবনে যে চাঞ্চল্য এবং অস্থিবতা, নানা ধবনেব অসামাজিক কার্যকলাপের বিকাশ, শিক্ষাবিদেব মতে অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাই তাব জন্য প্রধানত দায়ী। যাঁবা এ ধবনেব বিরুদ্ধ সমালোচক, কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট হলেও তাঁদেব বক্তব্যেব দু'টি প্রধান কথা অস্বীকাব করা চলে না।

বিরুদ্ধ সমালোচকদেব মতে আমেবিকার মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বড গলদ এই যে শিক্ষা সম্প্রসারণেব অজুহাতে শিক্ষাধারার ঐক্য ও সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রুচি ও শক্তিব অধিকারী বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিযয় অধ্যযন করুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের রুচির দোহাই দিয়ে যদি কেবলমাত্র তাদের মর্জি মাফিক বিভিন্ন বিষয় পডতে দেওযা হয়, তবে শিক্ষা নিরর্থক হযে পডতে পাবে। বর্তমানে আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের যে ফিরিস্তি থাকে, তাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, বহুক্ষেত্রে কোন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা পর্যন্ত নেই। ছাত্রছাত্রীরা সেই বিচিত্র বিষয় সমাবেশের মধ্য থেকে খুশীমত কয়েকটি বিষয় বেছে নেয়, কিন্তু সে সমস্ত বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ বা সম্বন্ধ আছে কিনা তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। অসংবদ্ধ কতগুলি বিষয় সম্বন্ধে তথ্য হয়ত শেখে, কিন্তু তাতে পুরোপুরি মানসিক বিকাশ হয় না। সাহিত্য, গণিত বা ইতিহাস না পড়েও লোকে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে সেখানে শিক্ষা প্রণালীতে গলদ রয়েছে এ কথা মানতেই হবে। মাধ্যমিক স্কুলে যদি সাতটি বিষয় পাঠ্য নির্ধারিত হয়, ছাত্র বা ছাত্রী হয়ত

ইংরিজি, মোটর চালানো, ব্যায়াম, ভূগোল, কাঠের কাজ, সেলাই এবং ক্ষৌরকর্ম এই সাতটি বিষয় নিয়ে ফিরিস্তি ভরে দিল, কিন্তু তার ফলে তার না হল মানসিক, না হল বিশেষ কোন বৃত্তি বা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ। এক কালে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীর বিষয় নির্বাচনের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকত না। ফরাসী বিপ্লবের পরে নেপোলিয়ন যে পাঠক্রম প্রচলন করেছিলেন, তাতে ভাষা, সাহিত্য গণিত ইতিহাস ভূগোল প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য ছিল। বর্তমানেও রুশ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে পাঠক্রম, তাতে ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে সমস্ত বিষয় পড়তে হয়, ব্যক্তিগত রুচি বা স্পৃহাকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করা হয় না। এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে আমেরিকা একেবারে বিপরীত মুখে চলেছে। আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর অবাধ স্বাধীনতা ও রুষদেশের শিক্ষাপ্রণালীতে নির্বাচনের অধিকার পর্যন্ত অস্বীকার—এ দু'টি বিরোধী আদর্শের সমন্বয় করে একপক্ষে নির্বাচনের স্বাধীনতা ও অন্যপক্ষে পাঠক্রমের সংহতি স্থাপন করতে পারলেই মাধ্যমিক শিক্ষার সত্যিকার উৎকর্ষ সম্ভব হবে।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় গলদ শিক্ষার মানের অবনতি। সমাজের সকল ছেলেমেয়েরাই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, অথচ সকলের সে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় সাধারণ ভাবে এ মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে যে ছেলেমেয়েদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে, তারা যেন কখনো আশাভঙ্গের মনোকষ্ট না পায়। পূর্বেই বলেছি যে সারা আমেরিকায় উৎসাহ এবং সাফল্যের এমন একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছে যে পরাজয় বা বাধাবন্ধকের কথা তারা শুনতেই চায় না। এ-রকম মনোবৃত্তি কাজে উৎসাহ এনে দেয়, কিন্তু মানুষের জীবনে জয়পরাজয় দুইকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে না পারলে কখনো কখনো বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অন্যক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যকে এমনভাবে বড় করে দেখবার ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে। কিশোর বয়সে কেউ যেন বিফলতার দুঃখ না পায় এ দাবী মেটাবার চেষ্টায় পরিশ্রম বা সাধনার মূল্য কমে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা জানে যে লেখাপড়া করুক আর না করুক, অধীত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিক আর না দিক, তাদের স্কুল জীবন সফল হবেই, কাজেই অল্পবয়স থেকেই তারা পড়ালেখাকে খানিকটা অবহেলা

করতে শেখে। অবশ্য সকলের বেলায় এ কথা খাটে না। আমেরিকাতেও সত্যিকার জ্ঞানসাধকের অভাব নেই, কিন্তু তাদের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অন্যদেশের সঙ্গে তুলনীয় হলেও শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে অনেক কম। আমেরিকার বহু শিক্ষাবিদ খেদের সঙ্গে বলেছেন এবং আজো বলেন যে সতেরো আঠারো বৎসর বয়সে আমেরিকান তরুণ তরুণী সাধারণত যে জ্ঞানের অধিকারী, বহুক্ষেত্রে ইয়োরোপের কিশোর কিশোরীরা পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই তা অর্জন করে। এমন কি আমেরিকার প্রতিবেশী ক্যানাডায় সতেরো বৎসরের শিক্ষার্থীকে যতখানি শিখতে হয় আমেরিকান শিক্ষার্থীর তুলনায় তা অনেক বেশী।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার এ দুর্বলতা কলেজী শিক্ষায় বহুপরিমাণে দূর হয়ে যায়। পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় কাজের অভাব নেই। অভাব মানুষের। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার পরেও যারা বিদ্যা অর্জন করতে চায়, তারা নেহাত জ্ঞানান্বেষার জন্যই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অর্থোপার্জনের দাবী মেটাবার জন্য কলেজী শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রবাহূতের স্থান নেই বললেই চলে। মেধাবী ও একাগ্র ছাত্রই কলেজে ভর্তি হয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার গলদ শোধরাতে দু'এক বৎসর কেটে যায়। কলেজের তৃতীয় বৎসরের পর থেকে এবং বিশেষ করে প্রথম ডিগ্রী-লাভের পরে আমেরিকায় শিক্ষার যে মান, পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষা-ধারার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গলদের বিষয় কিন্তু আজ আমেরিকার শিক্ষাবিদ খুবই সচেতন হয়ে পড়েছেন। আমেরিকার বিপুল ঐশ্বর্য এবং জনসাধারণের সহৃদয় ব্যবহার ও উদারতা সত্ত্বেও দেশে বিদেশে আমেরিকানদের নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়। ইয়োরোপের লোক সবরকমে আমেরিকার সাহায্য নিয়েও আমেরিকাবাসীকে খানিকটা অবজ্ঞা করে। এককালে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায়নি। আমেরিকাবাসী স্বদেশ ও স্বজাতি নিয়ে মশগুল থাকত, বাহিরের পৃথিবীর ব্যাপার নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাত না। দুই মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সে অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। বর্তমানে বহু ব্যাপারে আমেরিকাবাসীর হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব এসে পড়েছে, কিন্তু তবু ইয়োরোপের বাসিন্দা তাদের পুরোপুরি স্বীকার করতে চায় না। গত চল্লিশ বৎসরে

আমেরিকা বিভিন্ন দেশকে যে বিপুল সাহায্য করেছে, মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা সহজে মিলবে না, কিন্তু যারা উপকার পেয়েছে, তারাও তা স্বীকার করতে চায়নি। বস্তুতপক্ষে বহুক্ষেত্রে উপকারের প্রতিদানে আমেরিকার ভাগ্যে বিরাগই জুটেছে বেশী।

আমেরিকার অনেক শিক্ষাবিদেরা মনে করেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতা এ অবস্থার জন্য দায়ী। সুসংবদ্ধ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করলে সংহত ও আত্মস্থ মানুষ গড়ে উঠবে। বিভিন্ন বিষয় এলোপাথারী ভাবে পড়লে চরিত্রেও যে খানিকটা অনুশাসনহীনতা আসবে তাতেও বিচিত্র কি? মাধ্যমিক শিক্ষার শ্লথতার ফলে ব্যক্তি-চরিত্রে দৃঢ়তা আসে না, এবং বয়স্ক আমেরিকানের মধ্যেও কৈশোরসুলভ চপলতা থেকে যায়। খালি চপলতা বলে নয়, কৈশোরের যে আত্মপ্রত্যয়, বয়স্ক লোকের মধ্যে তার অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখলে অনেক সময়ে বিসদৃশ লাগে। কঠিন সমস্যার জটিলতাকে অস্বীকার করাও তরুণসুলভ অনভিজ্ঞতার পরিচয় বহুক্ষেত্রে জটিলতম রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক সমস্যার যে সহজ সমাধান আমেরিকাবাসী করতে চায়, তাতে অন্য দেশবাসীর মনে যুগপৎ উপহাস ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই সব কারণেই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমেরিকাবাসীর প্রতি খানিকটা বিরাগ জমে উঠেছে, আমেরিকান চরিত্রের বিপুল উদ্যম, বিরাট কর্মক্ষমতা ও উদার সহৃদয়তার পুরোপুরি কদর হয়নি।

কার্তিক ১৩৬৩

॥ তিন ॥

আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর খানিকটা আলোচনা আগেই করেছি। সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে আমেরিকার বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে গিয়ে শিক্ষা নিয়ে এত আলোচনার কি প্রয়োজন তবে তার উত্তরে বলব যে শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই আমেরিকার বর্তমান বৈভব ও শক্তি গড়ে উঠেছে, আবার শিক্ষাপ্রণালীর দুর্বলতার ফলেই আমেরিকার সমাজজীবনের প্রধান প্রধান গলদগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই দোষে-গুণে আমেরিকার সমাজকে বুঝতে হলে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বিশদ আলোচনা করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে বিজ্ঞানকে এ-ভাবে প্রয়োগ আর কোন দেশ করেনি এবং তারই ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকা অর্থ, উদ্যোগ ও অস্ত্রশক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে যন্ত্র-সভ্যতা যে ভাবে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও তার তুলনা মেলে না। তবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্র এ বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমেরিকায় সমাজের সকল স্তরে সমতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকিরণে শিক্ষার যে দান সে কথার উল্লেখও আগেই করেছি। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে আমেরিকাবাসী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যে উৎকর্ষ সাধন করেছে, তার তুলনা বোধ হয় আর কোথাও মিলবে না।

আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি বড় দুর্বলতার জন্য যে সে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানত দায়ী সে বিষয়েও খানিকটা আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সুসংবদ্ধ ও ঐক্যীভূত নয় বলে জাতীয় চরিত্রগঠনে যথাযথ কার্যকরী হয়নি। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত নয় বলে কিশোর-কিশোরীদের জীবনে বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিশোর বয়সের অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম শিক্ষার কাজে পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না বলে নানা কাজে অকাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়ন স্বদেশে যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করেছিলেন, তার ফলে ষোল সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীর বিষয় নির্বাচনে কোনই স্বাধীনতা থাকত না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই প্রত্যেকটি বিষয় প্রায় সমান মনোযোগ দিয়ে

পড়তে হত বলে তাদের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ শিক্ষাকার্যে নিবিষ্ট থাকত। কেবল যে বিবিধ বিষয় পড়তে হত, তা নয়, শিক্ষার মানকেও এত উঁচু করা হয়েছিল যে শিক্ষার্থীর পক্ষে গাফিলতি করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। বর্তমানে রুশ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাতেও নেপোলিয়নী শিক্ষাধারার অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাচুর্য এবং শিক্ষামানের কঠিনতার ফলে সোভিয়েট কিশোর-কিশোরী সারা মনপ্রাণ দিয়ে বিদ্যা অর্জন করতে বাধ্য হয়। সমস্ত সময় ও উদ্যম পড়ালেখার কাজে নিঃশেষ হয় বলে বিভিন্ন ধরনের দুষ্টামি, অনুশাসন-হীনতা বা উচ্ছৃংখলতার অবকাশ বহুল পরিমাণে কমে যায়।

সে তুলনায় আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত অবনত বলে কিশোর-কিশোরীর সমস্ত সময় ও উদ্যম শিক্ষা-চেষ্টায় নিঃশেষ হয় না। আমেরিকার আবহাওয়ায় এমনিতেই সাফল্যেব প্রতি ঝোঁক, তার উপরে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনে প্রায় অবাধ অধিকাব এবং সর্বোপরি সে সমস্ত বিষয়েব যে মান, তা তাদের বুদ্ধি ও উদ্যমেব তুলনায় সহজ বলে আমেরিকার কিশোব-কিশোরী স্কুল-কলেজেব কার্যক্রমের বাইবে অপর্যাপ্ত সময় ও অব্যবহৃত উদ্যামের প্রকাশ খোঁজে। তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক বা সমাজবিবোধী কার্যক্রমেব মধ্যেও তাবা জড়িয়ে পড়ে। বিদেশীর চোখে কখনো কখনো আমেবিকার মাধ্যমিক ছাত্রসমাজের আচরণ বিসদৃশ লাগে—মাধ্যমিক শিক্ষার অবনত মান তার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই কেবল. উচ্চশিক্ষার তাগিদে নয়, আমেরিকাব সমাজজীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও তার মান বাডাতে হবে এ-কথা আজকাল আমেরিকার প্রায় সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। দশ এগারো বৎসর বয়স থেকে সতেরো আঠারো বৎসর পর্যন্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের যে কার্যক্রম, তাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক উদ্যম ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় না। তাতে একপক্ষে বিদ্যালাভ বা জ্ঞানার্জনে আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা খানিকটা পিছিয়ে পড়ে এবং পরে কলেজে গিয়ে সে ঘাটতি পুরোবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। অব্যবহৃত শক্তি ও উদ্যম নানা অপ্রাসঙ্গিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ-সব কথাই জাতির পক্ষে বড় লোকসান। কিন্তু তার চেয়েও বড় লোকসান এই যে কৈশোরের আদর্শ-উদ্বেল বৎসরগুলির অব্যব-

হার বা অপব্যবহার হয় বলে বহু ছাত্র-ছাত্রীর মনে জ্ঞানান্বেষা বিকাশ লাভ করে না। নিয়মিত পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। সাধনার ফলে চরিত্রে যে গভীরতা ও শক্তি আসে, তা আসে না। আমেরিকাবাসী সর্বদাই নতুনকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। তার ফলে যেমন উন্নতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়, অন্যদিকে চিত্ত ও চরিত্রে চপলতাও আসতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার গলদের ফলে বহুক্ষেত্রে সে ধরনের চপলতা জাতির জীবনে হানিকর হয়ে উঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কঠিনতর সাধনা করতে হলে সে সম্ভাবনা কমে আসবে। তরুণ বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কঠোর সাধনা করতে হয়, তবে তার ফলে বহু অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যুবক যুবতীর চরিত্রে এক নতুন দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ শক্তি আসবে।

আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় সকলরকমের শ্রমের যে মর্যাদা তার উল্লেখ আগেই করেছি। তার ফলে বহু লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষার আয়োজন করে। এ ব্যবস্থা যে কি বিপ্লবকারী পরিবর্তন; একশো বছর আগেকার বিলিতি শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। সেকালে বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুরু করে কলেজে স্কুলে প্রায় সর্বত্রই দু-ধরনের শিক্ষার্থীর পরিচয় মিলত। একদলকে বলা হত ভদ্রকুলজাত ছাত্র ; তারা সাধারণত ধনী পরিবার থেকে আসত এবং পারত-পক্ষে নিজের হাতে কোন কাজই করত না। আজ আশ্চর্য শোনাবে কিন্তু তখনকার দিনের বিলিতি সমাজে যারা জীবনে কোন প্রয়োজনীয় কাজে কোনদিন হাত লাগায়নি ; তাদেরই ভদ্রলোক বলা হত। বাকি থাকত স্বপরিশ্রমনির্ভর ছাত্রছাত্রীদের দল ; কিন্তু স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই তাদের খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখত। আজকাল অবশ্য বিলাতে এ-ব্যবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে এবং ধনী ও দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হতে বসেছে। আমেরিকার ছাত্রসমাজে এ-রকম শ্রেণীবিভাগ কোনো কালেই দেখা দেয়নি। সে দেশেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রয়েছে এবং একশো বছর আগে সে তফাত ইউরোপের চেয়ে কম ছিল না। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমেরিকায় দরিদ্র ছাত্র সামাজিক কোন অমর্যাদা ভোগ করেনি। বরং স্বকীয় পরিশ্রমে নিজের শিক্ষা ভরণপোষণের ব্যবস্থা করায় সমাজের চোখে সম্মানার্হ পরিগণিত হয়েছে।

শ্রমের মর্যাদাবোধের এটা হলো লাভের দিক কিন্তু দুনিয়ায় কোন জিনিসই অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ নয়। তাই শ্রমমর্যাদাবোধের একটা ক্ষতির দিকও আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে। স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়েরা নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষার অর্থ উপার্জন করবে, সমস্ত ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে শিখবে—প্রথম দৃষ্টিতে এ-ব্যবস্থা সবারই ভালো লাগবে, কিন্তু তার ফলে অত্যন্ত অল্প বয়সের শিশুরাও টাকা-পয়সা সম্বন্ধে যে ভাবে সচেতন হয়ে উঠে, তাকে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করা চলে না। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সর্বব্যাপী এবং অবৈতনিক। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে লেখাপড়া শিখবার জন্য ছোট ছেলেমেয়ের অর্থ উপার্জনের কোন প্রয়োজন নেই। তখনো কিন্তু তারা পকেট-খরচা হিসাবে বাড়ি থেকে যা বরাদ্দ তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য নানা ধরনের কাজ খোঁজে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজ বিলি করে, বিক্রি করে, কখনো দোকান থেকে চকোলেট কিনে তা খুচরোভাবে সওদা করে, এবং এমনি নানা উপায়ে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে সুরু করে। ফলে বহুক্ষেত্রে অত্যন্ত অল্প বয়সে অর্থোপার্জনের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দেয়, খুব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও মেতে উঠে যে কি ভাবে দু-পয়সা আয় করবে। বাইরের কাজে পয়সা কামানোর প্রবৃত্তি সব সময়ে সফল হয় না, তখন বাড়ির কাজের জন্যও তারা বাপ-মার কাছে পয়সা দাবী করতে সুরু করে। বহু পরিবারে দেখেছি যে মাকে ঘরকরনার কাজে সাহায্য করবার জন্য ছেলে-মেয়ে পয়সা পায়। বাড়ির বাগানে ফুলগাছের তদারক বা বাড়ির উঠোনে ঘাস কাটা, আগাছা পরিষ্কারের জন্যও বাঁধা হারে মজুরী দেবার রীতি রয়েছে। আমেরিকান দুয়েকজন বন্ধু এ-ব্যবস্থার সমর্থনে বলেছেন যে বাইরের লোক দিয়ে এ-রকম কাজ করাতে হলে যখন বাপ-মার পয়সা খরচ হত, তখন বাড়ির ছেলেমেয়েরা সে কাজ মুফতে কেন করবে? তাঁরা এ-কথাও বলেন যে এভাবে প্রথম জীবন থেকেই শিশুরা একপক্ষে শ্রমের মর্যাদা শেখে, অন্যপক্ষে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হয়। শুধু তাই নয়, তারা এ-কথাও শেখে যে আরাম বা আনন্দ করতে হ'লে যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ নিজের পরিশ্রমেই যোগাড় করতে হবে, বিনামূল্যে কোন জিনিসই জীবনে মিলবে না।

এ-সব কথা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু শিশুবয়সে টাকা-পয়সা

সম্বন্ধে বেশি সচেতন হলে জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এ-কথাও স্বীকার করতে হবে। বিশেষ করে বাড়িঘরের কাজকর্মে টাকা-পয়সার লেনদেনে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি টলে যায়। শিশুর জন্য মায়ের যে ভালোবাসা ও সেবা, টাকা-পয়সা দিয়ে তার মূল্য নিরূপণ করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনিভাবে বাপ-মার জন্য সন্তানের ভালোবাসা ও সেবাও অর্থনিরপেক্ষ। রান্নাঘরে মা যখন কাজ করে, তখন স্বামী-সন্তানের কল্যাণের জন্যই তার আগ্রহ। তার পরিশ্রমের আর্থিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে এবং ইচ্ছা করলে ঘণ্টা হিসাবে তার মেহনতের মূল্য নির্ণয়ও করা চলে, কিন্তু কোন পরিবারের গৃহিণীই খালি টাকা-পয়সার হিসাবে নিজের সংসার পরিচালনা করেন না। ছেলে-মেয়েরা বাড়ির কাজ করবে, বাপ-মাকে সাহায্য করবে, ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করবে—এটা তাদের সহজ এবং স্বাভাবিক পারিবারিক দায়িত্ব। শিশুবয়স থেকেই এ-দায়িত্ব যদি তারা আনন্দে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, তবে স্বজনপ্রীতি কমে যায় এবং পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। এমনিতেই বর্তমানের শিল্পপ্রধান সমাজে পারিবারিক সম্বন্ধ লোপ পেতে বসেছে। ব্যক্তি দিন দিন বেশিরকম আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠছে। তার উপর যদি শৈশব-বয়স থেকেই তারা পরিবারের স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের বদলে অর্থোপার্জনের ভিত্তিতে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সুরু করে, তবে তার ফলে যে পরিবার ও সমাজ টলে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেবল আমেরিকা বলে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগে বিবাহ-বন্ধন সহজেই ভেঙেই পড়ছে, যৌথপরিবার তো প্রায় অন্তর্নিহিত। ছোট ছোট পরিবারের মধ্যেও আগেকার মতো নিবিড় সংযোগ নেই। পারিবারিক জীবনের এ-সংকোচ ও বিলোপের ফলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমেরিকাতেই সেগুলি বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, এবং শৈশবজীবনে পারিবারিক কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রেও অর্থের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন যে তার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

বাড়ি-ঘরের কাজ-কর্মের জন্যও টাকা-পয়সার লেনদেনের ফলে যে কেবল পারিবারিক জীবনের হানি হয়েছে, তা নয়। মানবতার মূল্যবোধও তার ফলে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রয়োজনের জগতে মানুষ এবং পশুর মধ্যে

খুব বেশি তফাত নেই। জীবনের দাবি মেটাবার পরে উদ্বৃত্ত উদ্যম এবং শক্তির ব্যবহারেই মানুষ সমস্ত পশু থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশও এই অপ্রয়োজনের ক্ষেত্রে। পাঠ্য-অপাঠ্য পুঁথিপত্রের মধ্যে অবাধ বিচরণ অথবা শিল্পকলা সাহিত্য সংগীতের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ তাই মানুষের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুতপক্ষে প্রয়োজনের বাইরের জন্য যে জগৎ, সেই জগতকে চেনা এবং জানা মানুষের মনুষ্যত্বের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মানুষের সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান এবং আদর্শবাদ প্রয়োজনের জগতের তাগিদকে অস্বীকার ক'রে গড়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে অর্থকরী বিদ্যা একান্তভাবে প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই অর্থ সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন হলে মানবজীবনের মূল্যবোধের হানি হতে বাধ্য। যে সমাজে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও অর্থ উপার্জনের জন্য উদগ্রীব, সেখানে যে শৈশব থেকেই মূল্যবোধের বিকৃতি ঘটতে পারে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

অর্থোপার্জনের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে অধ্যয়ন অধ্যাপনার প্রকৃতিও বদলায়। শৈশব থেকে ছাত্র অর্থকরী বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং যে সমস্ত বিষয়ের কোন সাক্ষাৎ অর্থকরী প্রতিশ্রুতি নেই সেগুলিকে অবহেলা করতে চায়। অথচ জাতির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ-সমস্ত বিষয় বা বিদ্যাকে উপেক্ষা করা চলে না। অর্থসর্বস্ব সমাজে অন্যভাবেও বিদ্যাবত্তার প্রতি অনুরাগ খানিকটা কমে যায়। ইয়োরোপের বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য এই যে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে যে পড়াশুনা হয়, ছুটির সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তার চেয়ে বেশি পড়বে। এক কথায় ছাত্রজীবনের মেয়াদ যতদিন থাকে, ততদিন ছুটি-অছুটির বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ছাত্রদের জীবনের প্রধান করণীয় কাজ অধ্যয়ন। ভারতবর্ষের পুরাতন ঐতিহ্যেও অধ্যয়নকে তপস্যা বলে স্বীকার করে ছাত্রদের অন্য সমস্ত কর্ম থেকে বিমুখ করবার চেষ্টা হয়েছে। আমেরিকায় কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কলেজের শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, অনেক সময়ে তাদের উপরে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। কাজেই তারা যদি পড়া-লেখার চেয়ে অর্থোপার্জনের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবে তাতে আশ্চর্য হবার ততটা কারণ নেই। কিন্তু স্কুলে পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও যদি সমস্ত অবসর

সময় অর্থের ভাবনায় কাটায়, সমস্ত উদ্যম দিয়ে অর্থোপার্জনকে এত বড় করে দেখে, সেটা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনের তাগিদে যে-সব কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী অবসর সময়ে টাকা রোজগার করে নিজেদের পড়া-লেখার খরচ যোগায়, তাদের কথা আলাদা। সাধারণত তাদের চরিত্রবল এত বেশি, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও আগ্রহ এত প্রবল যে অর্থোপার্জন করেও তারা ঠিকঠিক পড়া-লেখার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় তা ঘটে না। সচ্ছল পরিবারের কিশোর-কিশোরী যখন খেয়ালের বশে বা কোন বিলাস-বাসনা পূর্ণ করবার জন্য সমস্ত অবসর অর্থোপার্জনে ব্যয় করে, তখন তাদের পাঠ্যজীবনের হানি হতে বাধ্য। দর্শনের বা পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছুটির তিন চার মাস অধীত বিদ্যাকে অধিক আয়ত্ত করবার বদলে যদি হোটেলে গিয়ে রেকাব বাসন ধোয়, তবে তার ব্যক্তিগত রুজি বেড়ে যায়, কিন্তু জাতীয় জীবনের দিক থেকে তাতে সমাজের ক্ষতি না লাভ সে বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

শ্রমের মর্যাদাবোধ এবং সর্বব্যাপারে সাফল্যলাভের সাধনা আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের দুটি মহৎ গুণ, কিন্তু এ-দুটি গুণের বিকৃতির ফলেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আবার শিক্ষাব্যবস্থায় এ-রকম বিকৃতি দেখা দিয়েছে বলেই জাতীয় চরিত্রে অবনতির লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে যেন-তেন প্রকারে সাফল্যলাভ করবার সাধনা কোন কোন ক্ষেত্রে এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সাফল্য বিচারেও অর্থসম্পদের মানদণ্ড এসে পড়ে বলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠে। সবাই চায় যে বেশি অর্থ উপার্জন করবে—এ-রকম চাওয়াতে অন্যায় কিছু নেই—কিন্তু যখন সে আকাঙ্খা তীব্র ও অপরিমিত হয়ে উঠে তখনই নানা বিসদৃশ ব্যাপার দেখা দেয়। মনে হয় যেন একজন অপরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অর্থোপার্জনে লেগেছে, প্রচুর অর্থ যদি আসে, তবে কি উপায়ে এল তা নিয়ে বেশি ভাবনার প্রয়োজন নেই।

যেমন ক'রেই হোক আর্থিক ব্যাপারে সাফল্যলাভ করতে হবে এই মনোবৃত্তি থেকেও নূতনের প্রতি মোহ জন্মে। সবাই যা করছে, তা-ই করলে সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না। এবং তা করতে না পারলে আর্থিক সফলতা লাভ কঠিন হবে। তাই আমেরিকার বহু তরুণ-

তরুণী নূতন কিছু করবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র। যাই করি না কেন, সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে—এ মনোভাব আমেরিকায় যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বোধ হয় অন্যত্র তার এত বেশী পরিচয় মেলে না। বিজ্ঞাপনের যে বাহুল্য আমেরিকায় প্রায় সমস্ত আগন্তুকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কারণও এই মনোবৃত্তির মধ্যেই মিলবে। শুধু তাই নয়, তাক লাগাবার চেষ্টায় এ-সব বিজ্ঞাপন কোন কোন ক্ষেত্রে রুচি ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তার জন্য যদি সমাজ, নীতি ও কল্যাণের হানি হয়, তবে তা করতেও বহু লোক পরাঙ্মুখ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সকলের সমর্থন চাই, সমাজের কাছে সমাদর চাই এই দোটানার ফলে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সবাই নূতন কিছু করতে চায়। বিজ্ঞাপনের আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির মধ্যে একপক্ষে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকাশের তীব্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎকট আগ্রহ। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিনিঃসঙ্গতার ভীতি যে-রকম প্রবল, একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও তা দেখিনি।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলি। একপক্ষে আমেরিকায় প্রত্যেক নরনারী স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করতে চায়। নিজস্ব অধিকারে সফল ও সার্থক হতে চায়। অর্থোপার্জনে ও যশোলাভে বিশিষ্ট হতে চায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর এত বেশী ঝোঁক দেওয়ার ফলে আমেরিকায় পারিবারিক জীবনের বন্ধনও খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। অন্যপক্ষে আমেরিকায় নরনারী যেভাবে সবাই মিলে-মিশে থাকতে চায়, কেউ অন্যের থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পরিগণিত হতে ভয় করে, তা-ও না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। স্কুলের ছেলেরা সবাই একই ধরনে চুল কাটে—কদমছাঁট চুল দেখেই বোঝা যাবে যে এরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। স্কুলের কোন বিশেষ উর্দি নেই। কিন্তু তবু সবাই প্রায় একই ধরনের পোশাক পরবে, একই ধরনের কথা বলবে, চিন্তার ক্ষেত্রেও সবাই একই ধরনের পথ অবলম্বন করতে চাইবে। সাধারণ আমেরিকানের পক্ষে একা থাকার মতন এত বড় শাস্তি বোধ হয় আর কিছুই নেই। ইংরেজ নিজের খবরের কাগজ, নিজের পাইপ, নিজের কুকুর বা নিজের বাগান নিয়ে থাকতে পারলেই তুষ্ট। আমেরিকান কিন্তু দশজনে মিলে গল্পগুজব, আড্ডা, হল্লা করতে না পারলে অস্বস্তি বোধ

করে। বিদেশী যারা এসে আমেরিকায় প্রথম বসতি পাতে, তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বহুক্ষেত্রে বাঁচিয়ে রাখে, নিজেদের ঐতিহ্য সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে থাকে। স্বতন্ত্র হতে তাদের কোন ভয় নেই। এক পুরুষেই পালা একেবারে উল্টে যায়। কিভাবে পিতৃপুরুষের দেশের স্মৃতি ভুলে মনে-প্রাণে আমেরিকান হবে এই হয় তাদের ছেলে-মেয়েদের একমাত্র সাধনা। বহু পুরুষ ধরে তারা যে আমেরিকান নয়, সে-কথা পাছে কেউ টের পায়, এসব নবীন আমেরিকানদের এই হয় সবচেয়ে বড় ভাবনা। বস্তুতপক্ষে পোশাকে-আশাকে, পান-ভোজনে, কথাবার্তায়, চিন্তা-ভাবনায় আমেরিকান যেভাবে যুগধর্মী, পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশেও একমাত্র কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তার নজির মিলবে না।

পূর্বেই বলেছি যে দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ-ধরনের সমীকরণ বা চরিত্রসাদৃশ্য বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য আর কোন দেশে দেখা যায় না। আমেরিকা এবং রুষদেশে যে এ ধরনের চরিত্রসাদৃশ্য দেখা যায়, তার কারণ আছে। ছুটি দেশেই যন্ত্রসভ্যতার চরম বিকাশ জাতীয় জীবনের লক্ষ্য। ছুটি দেশেই সমস্ত মানুষকে প্রায় একই ছাঁচে ঢেলে গড়বার চেষ্টা। রুশদেশে মার্ক্সবাদের লৌহকাঠামোর মধ্যে সকলের মানসিক ছাঁচ গড়ে উঠে, তার ব্যতিক্রম করা ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক। আমেরিকায় রাষ্ট্র ভয় দেখায় না, বাধ্য করে না, কিন্তু সকলের জন্য প্রায় একই ধাঁচের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সকলের একই সামাজিক লক্ষ্য বলে সেখানেও বেশির ভাগ নরনারী সমাজধর্মের ব্যতিক্রম করতে চায় না। যন্ত্রসভ্যতার প্রবণতার ফলেও পরস্পরের সাদৃশ্য বেড়ে যায়। যন্ত্রের ধর্মই এই যে একই রকম বহু জিনিস তৈরী করবে। সংখ্যায় তারা বহু, কিন্তু প্রকৃতিতে তারা এক। আমেরিকায় এবং আজকাল রুশদেশেও যন্ত্র মানুষের খোরাক যোগায়, পোশাক তৈরী করে, ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে। ফলে একই ধরনের খোরাক খেয়ে সকলের একই ধরনের রুচি গড়ে উঠে। সবাই একই রকম পোশাক পরে, একই রকম বাড়িতে থাকে। সমস্ত জীবনের ধাঁচ এক বলে তাদের মনের ধাঁচও যে এক হবে, চিন্তায় ঐক্য ও সাদৃশ্য আসবে, তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে?

মাঘ ১৩৬৩

॥ চার ॥

নানা দেশের নানা জাতির নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ধাঁচে ফেলে যে ভাবে আধুনিক কালের আমেরিকান গড়ে উঠেছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বোধ হয় এক ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মানুষের এত পাঁচমিশেলী পরিচয় মিলবে না। এ দেশে আর্য-অনার্য-মঙ্গোল-দ্রাবিড় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ তো ঘটেছেই, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার অপরূপ বৈচিত্র্য। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবাসীর চরিত্র ও জীবনদর্শনে এক নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয় মেলে। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় আমেরিকার মতন এত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ের এমন পরিচয় মিলবে না।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই দেশেই মেলে, কিন্তু এ সমন্বয়ের প্রকৃতি দুই দেশে পৃথক। ইতিহাসই বোধ হয় প্রধানত তার জন্য দায়ী। ভৌগোলিক সংস্থানে দুই দেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। নানা রকমের আবহাওয়া দুই দেশেই মিলবে। তবে আমেরিকায় বোধ হয় ঋতুর চক্রাবর্তন আরো বেশি সুস্পষ্ট। হিমালয় পাহাড়ের জন্য উত্তর এশিয়ার তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা হাওয়া ভারতবর্ষে পৌঁছয় না, কয়েকমাসের জন্য উত্তর ভারতে শীতের পরিচয় মিললেও ভারতবর্ষকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলাই সঙ্গত। আমেরিকায় বহু শহর গ্রাম গ্রীষ্মকালে হয়তো ভারতবর্ষের মতোই গরম। কিন্তু শীতকালে আমেরিকার প্রায় সকল অঞ্চলেই বরফ পড়ে। আমেরিকাকে তাই শীতপ্রধান দেশ বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ও আমেরিকার জীবনদর্শনের পার্থক্যের জন্য আবহাওয়া যতখানি দায়ী, দুই দেশের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে দায়ী।

ভারতবর্ষে যে সভ্যতার সমন্বয়, তা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। কবে কোন্ আদিম যুগে এ দেশে দ্রাবিড় এসেছিল, তার হিসাবও ইতিহাস ভুলে গিয়েছে। পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বেও এদেশে সভ্যতার যে বিকাশ তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তখন থেকে যুগের পরে যুগে নানা

জাতি সভ্যতার নানা স্তরে নানা অবদান এদেশে এনেছে, এবং তাদের দীর্ঘকালব্যাপী আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে আজকালকার ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সভ্যতায় বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের দানকে পৃথক করে দেখাও কঠিন। শুধু তাই নয়, এই দীর্ঘকালব্যাপী সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে অবলুপ্ত। এখানে-ওখানে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য হয়তো এখনো অব্যাহত, পরবর্তীকালে আগত বিদেশী অভিযাত্রীও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে ও করে, কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণের বিপুল অংশ এমন ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে বর্তমানে তাদের মধ্যে জাতি বা বর্ণের বিশুদ্ধতার সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য। তার খুব একটা মোটা উদাহরণ দিলেই চলবে। এককালে জাতিভেদ হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ সে বর্ণবৈষম্য একেবারে লুপ্ত। ঘনকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বা উজ্জ্বল-শ্যাম শূদ্রের পরিচয় দেদার মেলে ও মিলবে। বস্তুতপক্ষে একই পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস ও সংগঠনের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে স্বাধীন ভারতবর্ষে আইন করে অস্পৃশ্যতা দূর করলেও আজও এদেশে জাতিভেদের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বর্ণবৈষম্যের সমাধান ভারতবর্ষ বহুদিন পূর্বেই বহুল পরিমাণে সম্পন্ন করেছে।

তিন-চার হাজার বছরের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে ভারতবর্ষে যা সম্ভব হয়েছে, আমেরিকায় তিনশো বছরের ইতিহাসে তা যে পুরোপুরি সম্ভব হয়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বরং যে পরিমাণ সমন্বয় আমেরিকায় ঘটেছে তাই বিস্ময়কর। এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত অভিযাত্রী এসেছে তারা সবাই দলবেঁধে এক সঙ্গে আসেনি। সাধারণত এক এক দল অভিযাত্রী আসবার পরে দু-চারশো বছরের মধ্যে আর নতুন অভিযাত্রীর দল দেখা দেয়নি। ফলে প্রথমাগত অভিযাত্রীর দল এ-দেশের জনসমুদ্রে মিশে যাবার সুযোগ পেয়েছে। পরে যারা এসেছে, তাদের বেলায়ও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আমেরিকার ইতিহাসে তা ঘটেনি। প্রায় তিনশো সাড়ে-

তিনশো বছর আগে ইউরোপীয় অভিযাত্রীর আগমন সুরু হলেও বস্তুতপক্ষে বিগত একশো বছরেই আমেরিকার জনসাধারণের বিপুল অংশ সে দেশে পৌঁছেছে। বছরের পর বছর নতুন অভিযাত্রীর দল নতুন নতুন দেশ থেকে এসেছে। ইংরেজি ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রথমে বেশী ছিল, এবং ইংরেজি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করে বসেছিল বলে ভাষা-বিভ্রাট ঘটেনি, কিন্তু একমাত্র ভাষার ঐক্যকে বাদ দিলে জীবনের প্রায় অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আমেরিকায় যে বিরাট বৈচিত্র্য, আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসই তার জন্য প্রধানত দায়ী। এত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও আমেরিকায় একটি মহাজাতি গড়ে উঠেছে, যে কোন দেশে আমেরিকানের সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমেরিকান বলে চেনা যায়। এ বিস্ময়কর পরিণতির জন্য আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী যে কিভাবে দায়ী, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বহু জাতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে বলে আমেরিকায় যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তা গভীরভাবে জাতির জীবনে দানা বাঁধেনি। পূর্বেও বলেছি যে আমেরিকার মানুষ নিত্য নূতনের পূজারী। পুরাতন ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে যারা পুরোপুরি স্বীকার করিতে পারেনি, বহু ক্ষেত্রে তারাই অভিযাত্রী হয়ে আমেরিকায় এসেছে। নানা দেশের মানুষের মেলামেশার ফলে কোন দেশের ঐতিহ্যই ধ্রুপদী বলে স্বীকৃত হয়নি, তার ফলেও তারা নূতনকে সহজে গ্রহণ করেছে। বস্তু-সভ্যতার যে বিস্ময়কর বিকাশ আমেরিকায় দেখা দিয়েছে, ধ্রুপদীকে অস্বীকার এবং নূতনকে সাগ্রহে গ্রহণ তার অন্যতম কারণ।

জাতির সভ্যতা ও ঐতিহ্য তেমনভাবে দানা বাঁধেনি বলে আমেরিকার সমাজ-জীবনে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সমাজ ও পরিবার বন্ধন সমস্ত পৃথিবীতেই আজকাল পূর্বের তুলনায় খানিকটা শিথিল—এ শিথিলতা আমেরিকায় যত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, অন্যত্র বোধ হয় তার নজির মিলবে না। সিনেমা বা সস্তা সাহিত্যে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু তবু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমেরিকার সমাজ-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ বর্তমানে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন

জাতি, বিভিন্ন সমাজ-আদর্শ, বিভিন্ন ঐতিহ্যের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার ভিত্তি টলে গিয়েছে—আজও আমেরিকার সমাজ তার পরিবর্তে সর্বজনগ্রাহ্য নতুন আদর্শ, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক আমেরিকাকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের বিরাট লেবরেটরী মনে করলে অন্যায় হবে না। সেখানে পুরাতন সমাজব্যবস্থা, সমাজদর্শন বদলে যাচ্ছে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিও আমূল রূপান্তরিত হচ্ছে। মার্কস উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশ এবং সমাজের উৎপাদনী শক্তি কার দখলে তাই দিয়ে মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের বিচার করতে গিয়েছিলেন। নতুন তথ্য আবিষ্কারের মোহে মার্কস সমাজ-জীবনের অন্য বহু আবশ্যকীয় তথ্যের উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার যে যুগান্তকারী সে কথা অস্বীকার করা চলে না। আমেরিকার বিকাশ কিন্তু মার্কসের দু-একটি মূল সূত্রকেই পালটে দিয়েছে। ধনতন্ত্রের যে স্বরূপ মার্কসের কল্পনায় ধরা দিয়েছিল, আমেরিকান ধনতন্ত্রের তার সঙ্গে খুব বেশি মিল নেই। মার্কস ভেবেছিলেন যে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনিকের ধনবৃদ্ধি ও শ্রমিকের শ্রম ও ক্লেশবৃদ্ধি সমানভাবে চলবে। আমেরিকায় ধনিকের ধনবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকও সমানভাবে লাভবান হয়েছে। তার শ্রমের পরিমাণ কমেছে, মূল্য বেড়েছে। আজ আমেরিকায় সাধারণ শ্রমিক যে আরাম ও আয়াসে জীবন কাটায়, অনেক দেশে ধনিকের ভাগ্যেও ততখানি আরাম আয়াস জোটে না। আমেরিকার শ্রমিকমহলে এ প্রসঙ্গে নানা গল্প লোক-মুখে বহুল প্রচারিত। ভালো বাড়ি, ঘর-দোর শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা, খাদ্যপানীয় রাখবার মতো ফ্রিজিডেয়র বা বরফের কল এবং অন্তত একখানি মোটর গাড়ি নেই—এ রকম কর্মী বা মজুরের পরিচয় সাম্প্রতিক আমেরিকায় মেলা কঠিন। বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় সাধারণ পরিবারের মানুষ যে আরামে থাকে, আমাদের দেশে বড়লোকের ভাগ্যেও তা বহুক্ষেত্রে জোটে না। অবশ্য জিনিসপত্তর বাড়লে মনের আনন্দ বাড়ে কি না, বহু-সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকলে চিত্তের শান্তি মেলে কি না, সে প্রশ্ন আলাদা।

আমেরিকায় যে সর্বসাধারণের জন্য সমস্ত জিনিসের প্রাচুর্য, তার অন্যতম কারণ এই যে আমেরিকার অভিজ্ঞতায় অর্থনীতির পুরানো নিয়ম অনেকখানি বদলে গিয়েছে। প্রাচীন অর্থনীতি শেখাতো যে পৃথিবীর কতকগুলি দেশ

কাঁচামাল উৎপাদন করে, সেগুলি শিল্পপ্রধান দেশে রপ্তানি হয়ে নানা রকম ব্যবহারের জিনিস তৈরি হয় এবং সেই তৈরি জিনিস আবার কাঁচা মালের দেশে ফিরে আসে। কাঁচা মালের প্রয়োজনে শিল্পপ্রধান দেশগুলি অন্য দেশকে দখল করে রাখে, উপনিবেশ বলে গণ্য করে। তাতে শিল্পপ্রধান দেশের লাভ হয় দুভাবে। রাষ্ট্রীয়শক্তি ব্যবহার করে কাঁচা মাল কম দামে কেনে এবং কাঁচা মাল পাবে সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি জিনিস নিজের উপনিবেশে বেশি দামে বিক্রয় করে—অন্য দেশের তৈরি জিনিস সেখানে আনতে দেয় না। এমনিভাবে প্রধানত বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঊনবিংশ শতকের সাম্রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল এবং তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেই মার্কস সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব, এবং ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য সব রকমে বেড়ে যাবে।

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ মার্কস করেছিলেন, তাকে যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়, তবে মার্কসপন্থীর হিসাবে আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী বলা চলে না। আমেরিকা উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে না, তৈরি জিনিস উপনিবেশে ফেরত পাঠায় না। আমেরিকা বোধ হয় বর্তমানে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখান থেকে কাঁচামাল এবং তৈরি জিনিস সমানভাবে বিদেশে রপ্তানি হয়। আমেরিকার বিরাট স্থলপরিবেশে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কাঁচামালই উৎপন্ন হয়, এবং এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে নিজের দেশের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরে রপ্তানি করবার কোন বাধা থাকে না। কাঁচমালের উৎপাদন যেমন প্রচুর, তৈরি জিনিসের উৎপাদন বোধ হয় তার চেয়েও বেশি। এত বেশি কল-কারখানা মোটরগাড়ি যন্ত্রপাতি আর কোন দেশে তৈরি হয় না। তাই গম তুলো এবং অন্যান্য কাঁচা মালের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রকমের তৈরি জিনিসও বাইরে চালান হয়। শুধু তাই নয়, আমেরিকার নিজের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এত বেশি, খরিদ্দারের দাবি এত প্রবল যে বাইরের পৃথিবীতে জিনিস না পাঠিয়েও আমেরিকা বিশাল শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারে। আমেরিকা যে উপনিবেশ শাসন বা বিদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি, এবং অতি সহজে স্বেচ্ছায় ফিলিপাইনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে, তারও

অন্যতম কারণ এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মিলবে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে আমেরিকার পত্তন হয়েছিল বলে আমেরিকাবাসী সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবিরোধী। নানা দেশের বিদ্রোহীর সমাগমে আমেরিকার জনসংগঠন গড়ে উঠেছে বলে স্বাধীনতাস্পৃহা সেখানে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উপর আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস যে ধারা অবলম্বন করেছে, তার ফলে আমেরিকা যে অন্য দেশ জয়কে খানিকটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখবে, তাতে বিচিত্র কি ?

রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্যের যে পরিচয় আমেরিকায় মেলে, তার উল্লেখ আগেই করেছি। কোন জিনিসের অভাব নেই বলে আমেরিকায় সমাজের সকল স্তরেই প্রাচুর্যের পরিচয় মেলে। বরং বলা যেতে পারে যে বহুক্ষেত্রে প্রাচুর্য অপচয়ে রূপান্তরিত হয়। সত্যি যে ভাবে আমেরিকায় সব জিনিসের ছড়াছড়ি, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। হোটেলে গিয়ে খাবার অর্ডার দিলে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, যে কোন লোকের পক্ষে তার সদ্ব্যবহার করা কঠিন। যদি বলা হয় যে এত চাই না, খানিকটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তবে সোজা উত্তর দেবে যে যতটুকু খুশি খাও, বাকি ফেলে দিলেই চলবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন এ দেশে বহু আমেরিকান সৈন্য এসেছিল, তখন দেশের লোক তাদের অপব্যয়ের খানিকটা পরিচয় পেয়েছে। বাংলাদেশে তখন দারুণ অন্নকষ্ট, পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিয়েছে সে কথা বাঙালী কখনো ভুলবে না। সেই অনটনের দিনেও কিন্তু আমেরিকান সিপাহী কোন জিনিসের অভাব বোধ করেনি। তারা নিজেরা তো খেয়েছেই, এবং বহুক্ষেত্রে নিজেদের উদ্বৃত্ত খোরাক বিলিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে তোমাদের দেশের খোরাক আমরা একটুকুও নিইনি, আমেরিকা থেকে এ খোরাক আমরা এনেছি। আনারসের রস বা কমলা-লেবুর রসের মস্ত বড়ো টিন কেটে তারা এক পেয়ালা খেয়ে বাকিটা ফেলে অথবা বিলিয়ে দিয়েছে। মস্ত বড়ো রুটির একটুকরো খেয়ে বাকিটা ছুড়ে ফেলেছে। তারা লোকদেখানোর জন্য এ-রকম করেনি। নিজেদের দেশে প্রতিদিন যেভাবে জিনিসের অপচয় করে, এ দেশেও তার-ই জের বজায়

রেখেছে। আজও আমেরিকার যে কোন শহরে গ্রামে গেলে আতিশয্যের বাড়াবাড়ি এবং খাদ্যদ্রব্যের অপচয়ের পরিচয় মেলে। কেবল খাদ্যদ্রব্য নয়, সমস্ত জিনিসই তারা যেন খানিকটা অবহেলা, খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে চায়। জিনিসের চেয়ে মেহনতের দাম ঢের বেশি বলে আজকাল আমেরিকায় এক বিশেষ ধরনের কাগজের সার্ট কাগজের স্যুট তৈরী হয়েছে; সে-রকম সার্ট বা স্যুট কিনতে যত পয়সা লাগে, ধোয়াতেও প্রায় তাই লাগে বলে অনেক লোক এ সব কাপড় একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়।

কেবল খাদ্যদ্রব্য পোশাক-আসাক বলে নয়, আমরা যে জিনিসকে মূল্যবান বা মহার্ঘ মনে করি, আমেরিকাবাসীর তার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ নেই। আমরা মোটরগাড়ি কিনলে সাবধানে যত্নে তাকে আট-দশ বৎসর চালাতে চাই, কোন কোন ক্ষেত্রে একই মোটর কুড়ি বছর পর্যন্ত চলে। আমেরিকার লোক বছর ফুরোবার আগেই পুরানো মোটর নাকচ করে কেমন করে নতুন মোটর কিনবে সেই ভাবনায় ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেদিন পড়েছিলাম যে একজন আমেরিকান বিলেতে একখানি পুরানো মোটর বিক্রি করতে গিয়েছিল। দোকানদার গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করে, দরজা-জানালা টেনে-টুনে দেখে দর ঠিক করল। আমেরিকায় দোকানদার এসব করে না। একবার গাড়ির নির্মাতার নাম ও তৈরির বছর দেখে দাম বলে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন বছরে কি ভালো গাড়ি বেরিয়েছে তার গুণে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। বিক্রেতার পুরানো গাড়ি নিয়ে তার বদলে নতুন গাড়ি গছাবার জন্যই তার বেশি আগ্রহ। বস্তুতপক্ষে, এ-সব ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীই একেবারে আলাদা।

ইয়োরোপে যে কোন শহরে গেলেই সেখানকার প্রাচীন কীর্তির প্রতিই প্রথম দৃষ্টি পড়ে। কোন কারখানার মালিক বা ম্যানেজার এক শো বছর আগে সে কারখানায় কিভাবে কাজ সুরু হয়েছিল, পুরানো কারখানার আজও যে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে গর্বের সঙ্গে তার বিবরণ দেয়। আমেরিকার বেশির ভাগ শহরেই পুরানো কীর্তির কোন বালাই নেই। কারখানায় গেলে মালিক ম্যানেজার গর্বের সঙ্গে বলে যে সবই সেখানে আনকোরা নতুন, এমন কি এক টুকরো পুরানো ইঁটও বোধ হয় নেই, সমস্ত

কারখানা ঢেলে সেজে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দু-চার বছর পরে বার বার করা হয়। নিউইয়র্ক শহরে বসেই প্রতিদিন আমেরিকাবাসীর নতুনের মোহ এবং স্থায়ী জিনিসের প্রতি বিরাগের পরিচয় মেলে। চোখের সামনে দামী ভারী পাকা ইমারত ভেঙে ফেলা হয়—ইয়োরোপের যে কোন দেশে বোধ হয় সে ধরনের ইমারত ভাঙবার কথা লোকে ভাবতেও পারে না—তার বদলে নতুন ধরনের নতুন অট্টালিকার পত্তন হয়। যে কোন বড় শহরে গেলে দেখা যাবে যে শহরের ঠিক বাইরে হাজার হাজার মোটরগাড়ি পড়ে রয়েছে। আমাদের চোখে সে গাড়ির জৌলুষ, তার পরিচ্ছন্নতা লোভনীয়, কিন্তু খবর নিলে জানা যাবে যে এ সমস্ত গাড়িই পরিত্যক্ত। স্থানটিকে মোটরগাড়ির কবরস্থান বললে অত্যুক্তি হবে না এবং বহু শহরেই এ ধরনের কবরস্থান রয়েছে।

নতুন সমাজ নতুন সভ্যতা গড়বার প্রেরণায় আমেরিকাবাসী যেন স্থায়ী সব জিনিসের প্রতিই খানিকটা বীতরাগ। তাকে সন্ন্যাস বলা মোটেই চলে না। আমেরিকাবাসী জীবনকে উপভোগ করতে চায়, উপভোগ করতে জানে, কিন্তু কোন জিনিসকে আঁকড়ে বসে থাকতে চায় না। জীবনের সে দেশে যে কী হুল্লোড় তা না দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন। যে যা করছে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে করছে, যখন যা হাতে নিচ্ছে, মনে হয় যে পৃথিবীতে তা ছাড়া আর বুঝি কিছু করণীয়, কিছু বরণীয় নেই। কিন্তু দু-দিন পরে যখন তার নূতনত্বের মোহ কেটে গেল, তখন আর লোকে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আমরা বলে থাকি যে ভারতবর্ষের মানুষ খানিকটা স্বভাব-বৈরাগী; জীবনের নশ্বরতা, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা মনে-প্রাণে অনুভব করেছি বলে আমরা সংসারে কিছু আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই না। সে কথা যে কতখানি সত্য, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ করা চলে। হয়তো বৈরাগ্য মনোভাব তার জন্য যতখানি দায়ী, আলস্য ও স্বভাবের জড়তা ঠিক ততখানিই দায়ী। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন ভারতবর্ষের লোক যে অনেক সময় সাংসারিক সাফল্যের বিষয়ে উদাসীন, সুখ-দুঃখ দুই-ই সমানভাবে গ্রহণ করে সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। ফলে পার্থিব সুখ, এবং বিশেষ করে বিলাস-ব্যসনের সামগ্রীর প্রতি ভারতবাসী বহুক্ষেত্রে বীতরাগ, এবং তাকেই আমরা আধ্যাত্মিকতা নাম দিয়েছি। আমেরিকায় সে ধরনের আধ্যাত্মিকতার

পরিচয় বেশী মিলবে না। কিন্তু এ-কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে আমেরিকাবাসী বিলাস চায়, কিন্তু বিশেষ কোন বিলাস-সামগ্রীর প্রতি তার মোহ নেই। সুখ চায়, কিন্তু সুখের উপকরণকে তাচ্ছিল্য ও অবহেলার চোখে দেখে।

জাতীয় চরিত্র যে তেমনভাবে দানা বাঁধেনি, আমেরিকার সামাজিক জীবনের আর একটি লক্ষণ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। নতুনের প্রতি মোহের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে আবেগ বা উচ্ছ্বাসের যে দমকা হাওয়ায় দেশের সমস্ত নরনারীর চিরাচরিত জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত টলে ওঠে, অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বা জমাট সমাজে তা বোধ হয় সম্ভব হয় না। বোধ হয় বলছি এই জন্য যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে, বাংলাদেশেও মাঝে-মাঝে এ-রকম হুজুগ ওঠে, তখন মানুষ যেন বিচারবুদ্ধি হিতাহিতভাব হারিয়ে ফেলে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ঠিক আগে এবং ঠিক পরে যেভাবে সাম্প্রদয়িকতার কালো হাওয়া সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, সাধারণত যাঁরা বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি তাঁদেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল এবং সেই উদ্বেগ ও পাগলামির মুহূর্তে ভালো লোকেরও যেভাবে বুদ্ধিভ্রম ও স্খলন ঘটেছিল, তা দেখার পরে আমেরিকাকে এ-বিষয়ে বেশি নিন্দা করা আমাদের সাজে না। শুধু এইটুকু হয়তো বলা চলে যে বাংলাদেশের হুজুগ অতটা ব্যাপক নয় বলে সাধারণত ততটা ক্ষতিকর নয় এবং ১৯৪৬-৫০ সালে যা কিছু ঘটেছিল, সে-সব জিনিস বাঙালীর স্বভাবের ব্যতিক্রম। অসাধারণ উত্তেজনার মুখে অত্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতি না হলে বোধ হয় এ-রকম ব্যাপার এ-দেশে ঘটত না। আমেরিকায় কিন্তু এ-ধরনের হুজুগ প্রায়ই ঘটে, দু-দিন পরে সবাই ভুলে গেলেও যতদিন আন্দোলন প্রবল থাকে, ততদিন তার বিরুদ্ধে কেউ বড় একটা দাঁড়াতে চায় না। ধর্মের নামে যে কত আন্দোলন আমেরিকায় চলেছে এবং চলছে, তার ইয়ত্তা নেই। নিরামিষ ভোজনকে সেখানে জাতীয় আন্দোলনের পর্যায়ে তোলা যায়। আবার হয়তো ঠিক তারই পাশে আরেক আন্দোলন জমে উঠল যার লক্ষ্য যে সবাই মাংস খাবে! পোশাক-আসাকের পরিবর্তন নিয়েও নানা রকম হুল্লোড় লেগেই আছে। আমাদের দেশে এককালে কীর্তনসভায় সবাই ভাবাবেগে আকুল হয়ে নাচতে গাইতে কাঁদতে সুরু করত, তার বহু বিবরণ মেলে। আজকালও হয়তো এ-

ধরনের অভিজ্ঞতা একেবারে বিরল নয়। আমেরিকার বহু ধর্মসভায় ঠিক সেই ধরনের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বক্তা বক্তৃতা করতে করতে এমন-ভাবে মেতে যান যে কখনো চীৎকার, কখনো কান্না, এমনকি কখনো কখনো উল্লম্ফন সুরু করে দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী ঠিক এক সুরে বাঁধা বীণার মতন বক্তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-আবেগে উত্তেজনায় আন্দোলিত হয়।

কত সহজে যে আমেরিকার জীবন-সমুদ্রে তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, অল্প কয়েক বছর আগেকার একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। বিভিন্ন গ্রহবাসীদের মধ্যে যুদ্ধকে ভিত্তি করে ওয়েলস একটি বিখ্যাত উপন্যাস এ শতাব্দীর গোড়ায় লেখেন। তখনো গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার কল্পনা কেবল-মাত্র কল্পনাই ছিল, এমন কী এরোপ্লেনের সম্ভাবনার বিষয়েও তখন বেশির ভাগ লোক সন্দিহান। সম্প্রতি গ্রহান্তরে যাবার অনেক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে এবং বলাবাহুল্য এ সব ব্যাপারে আমেরিকাই অগ্রণী! বস্তুতপক্ষে চন্দ্রালোকে যাবার জন্য সেখানে টিকিট বিক্রি পর্যন্ত সুরু হয়ে গেছে! আজ কয়েক বছর হলো একটি রেডিও কোম্পানী ওয়েলসের উপন্যাসের ধাঁচে একটি প্রোগ্রাম তৈরী করে এবং একদিন ঘোষণা করে বসে যে মঙ্গল গ্রহবাসী অতি-বুদ্ধিমান জীব পৃথিবীকে আক্রমণ করেছে। তার ফলে কেবল নিউইয়র্ক নয়, সমস্ত আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে যে বিরাট আলোড়ন এসেছিল, প্রত্যহের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেভাবে সমগ্র দেশে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সে কথা স্মরণ করে আমেরিকার সুধীবৃন্দ এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ এখনো আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এত সহজে দেশে যদি আন্দোলন, উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করা যায়, তবে জাতির জীবনযাত্রার সহজ প্রবাহকে বন্ধ বা ব্যর্থ করতে শত্রুকে বেশি বেগ পেতে হবে না। জাতীয় জীবনের জন্য এ-রকম সম্ভাবনা বিপজ্জনক। ইয়োরোপে এ-ধরনের রেডিও প্রোগ্রামের ফলে এতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো না বলে মনে হয়। এমনকি ভারতবর্ষেও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসের ফলে উত্তেজনার পরিমাণ যে বহুল পরিমাণে কম হতো, সে কথা খানিকটা জোর করে বলা চলে।

পূর্বেই বলেছি যে বহু ব্যাপারে আমেরিকা সমস্ত পৃথিবীর জন্য নতুন জীবনের অভিজ্ঞতার এক বিরাট লেবরেটরী। নরনারীর সামাজিক সম্বন্ধের বিষয়েও এ-কথা সত্য। প্রথম যখন আমেরিকায় ইয়োরোপীয় মানুষের

বসতি সুরু হলো, স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী ছিল, নারীর সংখ্যা ছিল কম। তাই আমেরিকার সমাজে নারী যে মর্যাদা ও আদর পেয়েছে, এবং আজো পাচ্ছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় তার নজীর মিলবে না। অনেক সময় ঠাট্টা করে বলা হয় যে নারী হয়ে জন্মাতে হলে আমেরিকার মতো দেশ নেই। পুরুষের পক্ষে বোধ হয় এশিয়া ইয়োরোপ আফ্রিকার সমস্ত দেশই প্রশস্ত। বিশেষ করে জাপান চীন ভারতবর্ষে যত সুবিধা, অন্য কোথাও ততটা নয়! সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য নানা কারণে আমেরিকার নারী প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছে, এবং সমাজবিকাশে তার পরিশ্রম ও দানের ফলে দিন দিন সে সমাদর বেড়েই গেছে। আমেরিকায় ইয়োরোপীয় উপনিবেশের প্রথম যুগে নারী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বন-জঙ্গল সাফ করেছে, ক্ষেত-খামারের কাজ করেছে, প্রয়োজন হ'লে বন্দুক পিস্তল নিয়ে লড়াই করেছে। কালক্রমে যখন বন-জঙ্গল সাফ হয়ে গেল, শত্রুভাবাপন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ রইলো না বা বশ্যতা স্বীকার করলো, ধীরে ধীরে নারীর সংখ্যা পুরুষের সমান হয়ে কালক্রমে পুরুষের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়ালো, তখনো কিন্তু পুরানো দৃষ্টিভঙ্গী সহজে বদলালো না। একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে সাধারণভাবে ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় পুরুষ-ই কর্তৃত্ব করেছে। সমাজ একান্তভাবে পুরুষ-পরিচালিত। আমেরিকায় এ পুরানো মনোভঙ্গী ধাক্কা খেয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশও তার জন্য অনেকটা দায়ী।

পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতির যেভাবে ব্যবহার হয়, অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত তা হয়নি। সব দেশেই যন্ত্রের ব্যবহার প্রধানত কারখানার কাজে, সমাজের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের তাগিদে। আমেরিকাতেই প্রথম যন্ত্রকে মানুষের গৃহদাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্রের ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙে, যন্ত্রের সাহায্যে প্রাতরাশ তৈরী হয়, যন্ত্র দিয়ে ঘরদোর সাফ করা হয়, পোশাক তৈরী ক'রে ধোয়ানো শুকানো হয়, যন্ত্রের সাহায্যে বাসন-কোসন ধোওয়ার ব্যবস্থা হয়। এককথায়, ঘর-বাড়ির সমস্ত কাজে যন্ত্র যেভাবে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে গিয়েছে, তার নিদর্শন অন্য দেশে মেলে না। যন্ত্রের ব্যবহারে ঘরের কাজের বোঝা লাঘব হয়েছে, সারাদিন ঘরের কাজে আটক থাকার

প্রয়োজন নেই। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শারীরিক শ্রমও কমে গিয়েছে। শারীরিক শক্তিরও আগেকার মতো অতখানি কদর নেই। তাই কলকারখানায় স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করে একই ধরনের উপার্জন করতে পারে। দু-ভাবে তাতে নারীর স্বাধীনতা বেড়ে গিয়েছে। ঘরের কাজ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে, এবং স্বোপার্জিত অর্থের ভরসায় আর পূর্বের মতো পুরুষ নির্ভর হয়ে থাকে না। নানা ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বনের ফলে নারীর এ স্বাধীনতা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে আমেরিকার সমাজে সকলের অগোচরে এক নীরব রূপান্তর ঘটে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ বিপ্লবের সুরু হয়েছে, কিন্তু আমেরিকায় তা যতখানি পরিণত, অন্যত্র কোথাও তা হয়নি। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ তাতে বদলে যাচ্ছে। পুরানো সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। আমেরিকাতেই নারী সর্বপ্রথম সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবী করেছে। যুক্তি দিয়ে নরনারীর সাম্যকে গ্রহণ করা যত সহজ, প্রতিদিনের জীবনে তাকে কার্যকরী করা তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই নরনারীর যে শ্রমবিভাগ ঘটেছে, তার ফলে পুরুষ বাইরের কাজ এবং নারী গৃহস্থালীর কাজ করবে এই ধারণা প্রায় নৈসর্গিক নিয়ম বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। মানুষের বংশরক্ষার দায়িত্বও প্রধানত নারী গ্রহণ করেছে এবং তার দৈহিক ও সামাজিক যে সব আনুষঙ্গিক, তার ফলেও নারী অধিক পরিমাণে গৃহনির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে আর্থিক ব্যাপারেও নারী কালক্রমে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করেছে। সহস্র বৎসরের এই সমস্ত প্রথা, রীতি ও বিশ্বাসের ছাপ যে কেবল নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায়, তা নয়, নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তির উপরেও তার প্রভাব সমান স্পষ্ট। যন্ত্রসভ্যতার বিবর্তনের আজ সেই বহুযুগ প্রচলিত সংস্কার বদলাতে সুরু করেছে। তার ফলে প্রথম প্রথম যে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। এককালে দুশ্চরিত্র অত্যাচারী রোগজীর্ণ স্বামীর অবহেলা ও অনাদর সহ্য করেও নারীকে গৃহধর্ম পালন করতে হতো, এবং যে স্ত্রী এ ধরনের অবজ্ঞা ও অপমান যত বেশী সহ্য করতে পারত, তাকে তত বড় সতী বলা হতো। প্রতিক্রিয়ায় আজ যদি স্বামীর

বাস্তব অথবা কল্পিত সামান্য ত্রুটির জন্য স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে, তবে তাতে দুঃখিত ও চিন্তিত হবার কারণ আছে, কিন্তু বিস্মিত হওয়া সাজে না। পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে এক কথায় বর্জন করতে পারত, আজকাল সমাজের কোন কোন স্তরে স্ত্রী স্বামীকে বিনা কথায় বর্জন করতে চায়।

স্ত্রী-পুরুষের সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি হবে তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আমেরিকায় এ সাম্যব্যবস্থার প্রথম পরিচয় বলে তাই সে দেশেই বিবাহবন্ধনছেদের দৃষ্টান্ত বেশি মেলে। এ প্রসঙ্গে কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমেরিকার নারী ও পুরুষ দুই পক্ষ থেকেই স্বাধীনতার দাবী প্রবল, তাই সে দেশে অনেক বেশি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে তালাক দেয় বা বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করে। অন্য দেশের থেকে তালাকের অনুপাত তাই স্বভাবতঃই বেশি। কিন্তু তাই বলে সব স্বামী বা স্ত্রী-ই যে বিচ্ছেদের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে, এ কথা ভাবলে গুরুতর অন্যায় হবে। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকাতেও সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-কোন্দল করেও মিলে-মিশে থাকে, সহজে বিবাহবন্ধন ছেদ করতে চায় না। বিচ্ছেদের অনুপাত যে অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি তার একটি প্রধান কারণ যে সমাজের একটি বিশেষ স্তরে মুষ্টিমেয় নরনারী বারবার বিবাহ করে, বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করে। অনেক সময় খবরের কাগজে দেখা যায় যে জনৈক পুরুষ পঞ্চমবারে যাকে বিবাহ করল, সেই নারীর পক্ষেও সেটি ষষ্ঠ বা সপ্তম বিবাহ। হিসাবে কিন্তু এ ধরনের বিবাহ বা বিচ্ছেদকে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে তফাত করে দেখা হয় না। সমাজে যদি শতকরা নব্বইজন স্ত্রী পুরুষও সারাজীবন একসঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে বাকি শতকরা দশজন স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে আটবার করে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ করলে হিসাবে দাঁড়াবে যে সমাজ ভেঙে পড়েছে, কারণ কাগজ-কলমে দেখা যাবে যে শতকরা চল্লিশ পঞ্চাশটি বিবাহই অসার্থক, অল্পদিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন জীবনসঙ্গী খুঁজছে। আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছেন, এবং আশাকরা যায় যে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতা ও সাম্য যখন দুই পক্ষেই সহজ হয়ে উঠবে, তখন বিবাহ-অনুষ্ঠানও পুরাতন মর্যাদা ফিরে

পাবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যখন প্রথম পত্তন হয়েছিল, তখন সে দেশে একখানি পোস্টকার্ড লিখেই বিবাহবন্ধন ছেদ করা যেত, কিন্তু আজকাল বোধ হয় ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রেই বিবাহচ্ছেদ করা বেশি কঠিন। সে দেশে আইন করে এবং সামাজিক আবহাওয়া বদলিয়ে পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ দিন দিন আরো মজবুত করবার চেষ্টা স্পষ্ট।

যন্ত্রের ব্যবহারে আমেরিকায় যে কেবল পারিবারিক সম্বন্ধের পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্বন্ধই তার ফলে বদলে যাচ্ছে। ভূগোল ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণার যে কি পরিবর্তন হয়েছে, সামান্য একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। একবার একজন আমেরিকান বন্ধুর গাড়িতে আমি যাচ্ছিলাম। আমার জন্য হোটেল আগেই ঠিক করা ছিল। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে হোটেলে যদি তাঁর জন্য জায়গা পাওয়া না যায়, তবে কাছেই তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে হোটেলে যখন জায়গা মিলল না তখন জানা গেল যে, যে বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে চান, হোটেল থেকে তা মাত্র একশো মাইল দূরে! টেক্সাস বা কালিফোর্নিয়া অঞ্চলে স্বামী-স্ত্রী একশো দেড়শো মাইল গাড়ি চালিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ডিনার খেতে যাট সত্তর মাইল যেতে হলে তা নিয়ে একবার দ্বিরুক্তিও করে না! আমেরিকায় মোটরগাড়ির যেভাবে প্রচলন হয়েছে এবং যেভাবে আমেরিকাবাসী মোটরগাড়ির ব্যবহার করে তা অন্য দেশবাসীর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। তিন চারশো মাইলের পথকে তারা পথ-ই মনে করে না—প্রতি বছর গরমের ছুটিতে সপরিবারে বেরিয়ে দু-তিন হাজার মাইল চক্কর দিয়ে আসে। তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের দূরত্ব ও বৈশিষ্ট্য দিন দিন লোপ পাচ্ছে, নানা দেশের নানা অঞ্চলের মানুষের দেহে-মনে নিখিল আমেরিকান ছাপ দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

আমেরিকায় মানুষ যন্ত্রকে দাস হিসাবে ব্যবহার করে, এবং বোধ হয় সেজন্যই আনুষ্ঠানিকভাবে দাসত্বপ্রথা আমেরিকাতেই প্রথম লোপ পায়। যন্ত্র হাতে পেলে আমেরিকান ছেলে বুড়োর আনন্দও দেখবার জিনিস। বহুবার দেখেছি যে বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা অতিথি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বৈঠকখানায় বসে গল্প করতে করতে আমার মনে হয়েছে যে এত স্থবির লোক নিজের বাড়ি ছেড়ে কিভাবে এলো? সেই বৃদ্ধই যখন গাড়ি চেপে বসল, তখন যেন এক অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার দেহ তাজা হয়ে উঠল। যেভাবে তারা মরীয়া হয়ে হয়ে গাড়ি চালায়, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। মোটরগাড়ির জন্য যে রাস্তা তৈরী হয়েছে, তাও অনুরূপ। প্রথমে জার্মানীতেই আউটোবান বা মোটররাস্তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় পার্ক-ওয়ে, থ্রু-ওয়ে, হাই-ওয়ে প্রভৃতি তার নানা রূপান্তর ঘটেছে। হাজার মাইল রাস্তা চলে গেছে, কোথাও এক পথ অন্য পথকে কাটে না, ফলে কোথাও চৌমাথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে থেকে গাড়ি আসবার সম্ভাবনা নেই। বিপরীতদিকের গাড়ি সমান্তরাল ভিন্ন পথে চলে, ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরাবার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা। সহজ কেবলমাত্র সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ। কোনদিকে মোড় ঘুরতে চাইলে বড় রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় নামতে হবে। উল্টো মুখে যেতে হলে তার জন্যে তিনবার রাস্তা বদলাতে হবে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের শোভা, বিরাট দেশের সৌন্দর্য—সব কিছু উপেক্ষা করে সোজাপথে মোটরগাড়ির দল ছুটে চলেছে। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলেও তৃপ্তি নেই। সত্তর আশি নব্বই মাইল বেগে গাড়ির পরে গাড়ি চলেছে। আমেরিকান এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তোমাদের দেশে এত রাস্তাঘাট, চারিদিকে এত প্রাকৃতিক শোভা শুধু সে পথে পায়ে হেঁটে চলবার লোক নেই। সে শোভা দেখবে বলে দু-দণ্ড কোথাও থামবে, হাই-ওয়ে, থ্রু-ওয়ে, পার্ক-ওয়ে প্রভৃতি রাস্তায় তার স্থান কই? গল্প শোনা যায় যে এক অশীতিপর আমেরিকান বৃদ্ধা তার নাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আজকাল রাস্তাঘাট এত ভালো, মোটর এত বেগে চলে, কিন্তু গন্তব্য পৌঁছে তোমরা করো কি?

আমেরিকার সমাজে যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার, কিন্তু তার ফলে মানুষও যে যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে, সে কথা সব সময় চোখে পড়ে না। নিউইয়র্কের বড় বড় হোটেলে কখনো কখনো সে কথা মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়। সব কাজ যন্ত্রের মারফত হয়, সব কিছু যন্ত্রের মতো ঘড়ির কাঁটা ধরে সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু যন্ত্র যদি একবার বিগড়ালো তো মানুষ একেবারে অসহায়। হোটেলের দালান ত্রিশতলা চল্লিশতলা—লিফ্‌ট ভিন্ন উঠা-নামা অসম্ভব।

কিন্তু সময় সময় লিফ্‌টের জন্য যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাতে মনে হয় যে সিঁড়ি ভাঙতে পারলেই ভালো হতো। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় খোরাক-পোশাকের ব্যাপারেও আজকাল আমেরিকাবাসী যেভাবে যন্ত্রনির্ভর তা দেখেও মাঝে মাঝে ভাবনা হয়, আশঙ্কা হয়। ভিড়ের সময় পথ চলতেও একথা বারবার মনে হয়। আমেরিকার জনসংখ্যা প্রায় পনেরো ষোল কোটি, কিন্তু সেদেশে মোটর গাড়ির সংখ্যা হবে প্রায় আট নয় কোটি, বাস লরী ট্রাক আরো আট নয় কোটি। অর্থাৎ যত মানুষ, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রযান তার চেয়ে সংখ্যায় বেশি! বড় বড় মোটরের কারখানা বিজ্ঞাপন দেয় যে পরিবারে একখানি মোটর থাকলে চলবে কি করে? কর্তা বা গিন্নী কাজে বেরোলে বাড়ির অন্য লোকের জন্য অন্তত আর একখানি গাড়ি চাই। দু-খানি ফোর্ড বা শেভ্রোলে না থাকলে পরিবারের সম্ভ্রম থাকে কি ভাবে? অগুন্তি গাড়ি বাড়াবার ফলে শহরে গাড়ি রাখবে কোথায় তা-ও এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের নিজেদের গাড়ি আছে, তারাও নিউইয়র্কে সহজে গাড়ি আনতে চায় না। শহরের কাছে পৌঁছে কোন শহরতলী বা পল্লীতে গাড়ি রেখে হয় বাসে ট্রামে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে চলে, নয়তো ট্যাক্সী নেয়। ভিড়ের সময় নিজেই দেখেছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে গেলে মোটরের চেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। গাড়ি রাখবার জায়গা নেই বলে স্বামী খালি গাড়ি চালাতে থাকে, ততক্ষণে স্ত্রী গিয়ে বাজার সওদা শেষ করে এবং যদি স্ত্রী যখন দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, ঠিক সেই সময় স্বামী গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে না পারে তবে স্বামীকে আবার চক্কর দিতে হয় আর স্ত্রী পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে! গত মহাযুদ্ধের সময় ঠাট্টা করে বলা হতো যে কলকাতা শহরে কাউকে টেলিফোন করতে যত সময় লাগে, ট্যাক্সী করে তার সঙ্গে তার চেয়ে আগে দেখা করে আসা যায়। নিউইয়র্কের বেলায় বলা চলে যে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশে আজ শহর এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে যে বহুক্ষেত্রে যন্ত্রকে বাদ দিয়ে আদিম কালের পায়ে-হাঁটা গন্তব্য-স্থানে বেশি তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়।

যন্ত্রসভ্যতার বিড়ম্বনার আরো অনেক নিদর্শন দেওয়া চলে। আমেরিকায় রান্নাঘরের যে উৎকর্ষ হয়েছে তাতে জড়োয়া গয়না এবং বেনারসী শাড়ি পরে রান্না করলেও বোধ হয় কাপড়ের ভাঁজ ভাঙবে না। গয়নাতেও বিন্দুমাত্র

কালি লাগবে না। শাক-সব্জি সব যন্ত্র দিয়ে কাটা চলে, ধোয়া হয়। মাছ-মাংস তো দোকান থেকেই অর্ধেক রান্না হয়ে এসেছে। বাড়িতে যেটুকু করতে হয়, তার জন্যও হাত ময়লা করবার কোন প্রয়োজন নেই। রেকাবি বাসন ধোয়ার জন্যও কল রয়েছে। রান্নার ব্যাপারেও গৃহিণীকে বেশি ভাবতে হয় না, বিজলীর এমনি সুব্যবস্থা যে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ক-মিনিট সিদ্ধ হবে, ক-মিনিট ভাজা হবে সব যন্ত্রই ঠিক ক'রে নেয়। গিন্নীর খালি মনস্থির করা প্রয়োজন, কিন্তু সব সময়েই সেইটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। কেবল আমেরিকান মহিলা বলে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমস্ত পুরুষ নারীর পক্ষেই একথা সত্য। এক আমেরিকান তরুণীর কাছে গল্প শুনেছি যে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে বান্ধবীকে রান্নাঘরের সমস্ত যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিয়ে শেষে ক্লান্ত হ'য়ে বললেন •যে,—চল, এবার হোটলে গিযে খেয়ে আসা যাক! আমেবিকায় বহু নবনাবীই বাডিতে রান্নাবান্না কবে যতবার খায়, হোটেল রেস্তরাতে নগদ পয়সায় তৈরী খাবাব খায় তার চেয়ে বেশি।

বিরাট দেশের বিচিত্র মানুষের পুরোপুরি পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তার নিজের সুখ-দুঃখ যে ব্যাকুলতা নিয়ে আসে, অন্য লোকে তাকে কেমন করে বুঝবে? স্বদেশের লোককেই যেখানে সহজে বোঝা যায় না, সাধারণভাবে কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তির প্রতি অবিচার করবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ভিন্ন দেশের নরনারীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে কথা বলায় যে ভুলভ্রান্তির অবকাশ কত বেশি, তা সহজেই বোঝা যায়। আমেরিকা সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছি, তার নমুনা সে দেশে নিশ্চয়ই মিলবে। কিন্তু খুঁজে দেখলে তার ব্যতিক্রম পেতেও মুশকিল হবে না। আর কত কথা যে না বলা রয়ে গেল, তার হিসাব কে দেবে? তাই শেষ কথা এই বলতে চাই যে নতুন পৃথিবীতে আজ সেখানে যে নতুন দেশ গড়ে উঠেছে, তার প্রাণ-প্রাচুর্যকে স্বীকার করে যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে তাকে বুঝতে চাই, তবে তাতে আমাদের এবং তাদের উভয়েরই লাভ। আমেরিকাবাসীর সহৃদয়তা ও অতিথিবাৎসল্যের কথা আগেও বলেছি। সে আতিথ্য ও সহৃদয়তা কেবলমাত্র মানুষের জন্য নয়, বিভিন্ন ভাবনা চিন্তাকেও তারা সমান আগ্রহে বরণ করে। বস্তুতপক্ষে তারা সর্বদা যেভাবে নিজেদের সমালোচনা করে, অন্যের মুখে নিজেদের সমালোচনা শুনতে চায়, তার

পরিচয় অন্যত্র এত ব্যাপকভাবে মেলে না। ব্যক্তি ও সমাজের কিসে উন্নতি হয়, কিভাবে বস্তু ও চিন্তার জগতে প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা যায়, সে ভাবনা আমেরিকায় অতি স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। অন্যদেশের মানুষ বোধ হয় এসব বিষয়ে খানিকটা চাপা, আমেরিকার মানুষ আজো তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে উচ্ছল ব'লে ঢাকাঢাকির কথা তাদের মনেই আসে না। বক্তৃতা করতে এবং বক্তৃতা শুনতে, আলোচনার ব্যবস্থা করতে ও আলোচনায় যোগ দিতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। কাউকে নিমন্ত্রণ করা হলো, খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে না হতে কেউ ব'লে বসবে যে অতিথি-অভ্যাগত স্বদেশ বা আমেরিকা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলুন। দু-চার কথা কিন্তু দু-মিনিটে শেষ হ'য়ে যায় না, কথার জের শেষে দীর্ঘ হ'য়ে যায়—আমার এ চিঠিগুলি যেমন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছে

সব দেশের মানুষে মানুষে মিলের অংশই বেশি। পার্থক্যগুলি ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণের ফলেই প্রকট হ'য়ে ওঠে। আমেরিকার বহু জিনিস প্রথম দৃষ্টিতে বিচিত্র বা কোন কোন ক্ষেত্রে বিসদৃশও লেগেছে। নতুনের ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে সময়ও লেগেছে। কিন্তু যেখানেই আমেরিকাবাসীর সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয়-লাভের সুযোগ পেয়েছি, তাদের প্রাণপ্রাচুর্য তাদের যৌবন-উচ্ছলতা, তাদের সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাদের গুণগুলি যৌবনের গুণ, তাদের যা দোষ-ত্রুটি সেগুলিও প্রধানত যৌবনধর্মের দোষ। পৃথিবীর কাছে তারা অনেক পেয়েছে, সমস্ত মহাদেশের সমস্ত জাতির ঐতিহ্যের তারা উত্তরাধিকারী। প্রকৃতিও তাদের বিপুল ঐশ্বর্য দিয়েছে। পৃথিবী তাই প্রত্যাশা করে যে বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার ও প্রকৃতির বিরাট দানের প্রতিদানে তারাও একদিন বিশ্বমানবকে বিরাট দান এনে দেবে।

বৈশাখ ১৩৬৪।

মস্কোর চিঠি

॥ এক ॥

১৯৫৬ সালে পৃথিবীর তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে জাপান গিয়েছিলাম, মে-জুন মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি মস্কো যাবার সুযোগ ঘটল। আমেরিকার বিষয়ে খানিকটা আলোচনা আগেই করেছি। ভবিষ্যতে কোনোদিন জাপান সম্বন্ধেও কিছু বলবার ইচ্ছা আছে। আজ সোভিয়েট রুশে যা দেখেছিলাম, তারই বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব।

শুরুতেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কোনো দেশকে সঠিকভাবে জানতে হলে তার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, ওতপ্রোতভাবে দেশের লোকের সঙ্গে মেলা মেশা প্রয়োজন। পাঁচ সপ্তাহের সফরে তার সুযোগ মিলবে কোথায়? তাই আমার মতন পাঁচ সপ্তাহের পর্যটকের পক্ষে কোনো দেশের জীবনের পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়া কেবল কঠিন নয়, বোধহয় অসম্ভব। আমার এ-লেখায় যদি কেউ রুশদেশ বা রুশ জাতির বিশদ ও সম্পূর্ণ ছবি দেখতে চান, তাঁকে হতাশ হতে হবে। সে-দেশের জীবনযাত্রার ধারা আমার মনে কি প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তারই হালকা বিবরণ হিসাবেই এ-ধরনের রচনার খানিকটা সার্থকতা থাকলেও থাকতে পারে।

নিজের দেশকেই ক-জন মানুষ ভালো করে জানে? ভারতবর্ষের বিষয়ে ভারতবাসীর লেখায় এত বিরুদ্ধমতের পরিচয় মিলবে যে অসতর্ক বিদেশী পাঠক দিশেহারা হয়ে পড়বেন। তাতে আশ্চর্য হবারও কোনো কারণ নেই। বিরাট দেশ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-রীতি, বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের সমাবেশে ভারতবর্ষে যে বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ করা সহজ নয়। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই আমরা যা দেখতে চাই, তাই দেখি। ইচ্ছার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও শক্তির প্রশ্ন থেকে যায়। যা দেখবার বা বোঝবার শক্তি নেই তাকে দেখব বা বুঝব কি করে?

ছয়জন অন্ধের হাতি দেখার মতন ভারতবর্ষের বিবরণও তাই দেশী ও বিদেশী লেখকদের রচনায় বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে বাধ্য। সব দেশের

বেলায়ই একথা খাটে, তবু যে-দেশ আয়তনে যত বড়, জনসংখ্যার বৈচিত্র্য ও সমাবেশ যত বেশি, তার বেলায় এ-প্রশ্ন তত বেশি জটিল হয়ে ওঠে।

অন্য দেশের তুলনায় রুশ দেশের সঠিক বিবরণ দেওয়া বোধ হয় আরো কঠিন। পৃথিবীর নানা জাতি বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রজা। পূর্ব সীমানা থেকে পশ্চিম সীমানায় পৌঁছতে হলে প্রায় আট-দশ হাজার মাইলের রাস্তা অতিক্রম করতে হয়, উত্তর থেকে দক্ষিণের পাড়িও কয়েক হাজার মাইল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের চেয়ে আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ বড়। সোভিয়েট রাষ্ট্র বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চার গুণ হবে। এতবড় বিরাট স্থলসমাবেশ পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রে মিলবে না। চীন, ব্রেজিল বা অস্ট্রেলিয়াও আয়তনে সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। বিরাট আয়তনের ফলে আবহাওয়ার বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক সংস্থানের পার্থক্য মানুষের আচার-ব্যবহার এবং জীবনরীতিকেও বিচিত্র ও বিভিন্ন করে তুলেছে।

বিরাট রাষ্ট্র এবং সে-রাষ্ট্র প্রকৃতির সহজ বিধানে একীভূত নয়। অস্ট্রেলিয়া আয়তনে বিরাট কিন্তু সাগরের বন্ধনে সমস্ত দেশ একসূত্রে বাঁধা। হিমালয়ের প্রাচীর এবং দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে সাগর-পরিখায় সীমাবদ্ধ ভারতবর্ষও প্রাকৃতিক বিধানেই এক বিরাট দেশ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান বিস্তারের কিন্তু সে-রকম কোনো নৈসর্গিক ভিত্তি মিলবে না। ভাষা, জাতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের পার্থক্য তো রয়েছেই ; সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐতিহাসিক ঐক্যের পরিচয়ও মিলবে না। প্রায় সাত-আট শত বছর ধরে রুশসাম্রাজ্য ধীরে-ধীরে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে নিজেকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছে, এবং তার ফলে মস্কোভির ক্ষুদ্র রাজ্য আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরাট বিস্তৃতিতে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাস ও ভূগোলের ধারা রুশসাম্রাজ্যকে যে-বৈচিত্র্য দিয়েছিল, রুশবিপ্লবের পরে সে-বৈচিত্র্য কমেনি, বরং বেড়েছে। বিপ্লবোত্তর রুশদেশে মানুষের সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান—সব কিছুকেই ঢেলে সাজার চেষ্টা হয়েছে। তার ফলে পুরানো পৃথিবীর

প্রচলিত জীবনধারার যে রীতি, অনেক বিষয়েই রুশসমাজে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে-ব্যতিক্রম মানুষের মনেও নানা ঘাতপ্রতিঘাত তুলেছে। কৃষ্ণভক্ত যেমন কৃষ্ণনামে আত্মহারা হয়ে পড়েন, ভালোমন্দকে শান্তভাবে বিচার করতে ভুলে যান, সাম্যবাদের নামে বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও তেমনি ভাববিহ্বলতা এসে যায়। সোভিয়েট বলতে তাঁরা ভক্তিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সাম্যবাদের যাঁরা বিরোধী তাঁদের মনে ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাম্যবাদের প্রতি তাঁদের যে বিরাগ, সে-বিরাগ রুশদেশ ও জাতির প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আবিল করে তোলে, গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে রুশ রষ্ট্রের যে কোনো উন্নতি হয়েছে সে-কথা স্বীকার করতে তাঁদের বুক ফেটে যায়।

ভক্তি বা বিদ্বেষের মাত্রা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিষয়ে শান্তভাবে বিচার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পৃথিবী আজ এমনভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে যে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ পরস্পরের প্রতিবেশী। তাই ধনতান্ত্রিক দেশকেও সোভিয়েট রুশ সম্বন্ধে জানতে হবে, রুশদেশেও আমেরিকা বা ইয়োরোপ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণার প্রয়োজন। এরকম পারস্পরিক মন-জানাজানি এবং সহযোগিতা আজ মানুষের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষায়, শিল্পে ও বিজ্ঞানে সোভিয়েট রাষ্ট্র গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সংগঠনের বিরোধী, স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির পরে তাঁদের সমালোচনাও অনেকখানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আকাশে সোভিয়েট-চন্দ্রের পরিক্রমার ফলে কিন্তু উল্টো এক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের নবতম অবদান সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকের দান, কিন্তু বহু দেশের বহু বৈজ্ঞানিকের সমবেত সাধনার ফলেই যে এ-বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভব হয়েছে সে-কথা ভুলে গিয়ে তার সমস্ত কৃতিত্ব সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক, এবং তার দৌলতে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দেবার এক মনোবৃত্তি আজ বহু বুদ্ধিমান লোকের মনেও গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকের সাফল্যে অনেকে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার মধ্যেও যে গলদ

রয়েছে, কঠিন মূল্য দিয়ে রুশদেশের মানুষ বিজ্ঞানে এ-উন্নতি অর্জন করেছে, সে-কথা আজ তাঁরা ভুলতে বসেছেন।

মস্কোতে আমি মোটে পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, এবং তারও অনেকখানি সময় হাসপাতালে কেটেছিল। তার ফলে আমার অন্যান্য সঙ্গীদের মতন অবাধে আমি ঘুরতে পারিনি। তাঁদের মুখে-শোনা কথার উপরেও আমাকে অনেকখানি নির্ভর করতে হয়েছে। হাসপাতালে থাকায় কিন্তু আমার একটা বড় লাভ হয়েছিল। সমস্ত সমাজব্যবস্থার পার্থক্য, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্ত শৃঙ্খলা ও বন্ধনের আড়ালে মানুষের প্রতি যে-দরদ, তার যে-পরিচয় আমি মস্কোতে পেয়েছি, হাসপাতালে না থাকলে বোধ হয় কোনোদিন তা মিলত না। আরো একটা লাভ হয়েছিল যে যাঁরাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁরা ঘরোয়াভাবে যতখানি স্বাধীনতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, সরকারীভাবে দেখাশোনায় তার সুযোগ মিলত কিনা সে-কথা বলা কঠিন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ কি ভাবে, তাদের মনের গতি কোন দিকে চলেছে, বিদেশীর পক্ষে তা জানা প্রায় অসম্ভব। একে তো ভাষার বিরাট ব্যবধান। খুব কম ভারতবাসীই রুশভাষা জানে আর রুশদেশেও খুব কম লোকেই অন্য ভাষা জানে। তাছাড়া অন্য ভাষা জানলেও রুশবাসী সহজে তা ব্যবহার করতে চায় না। আমি যে হাসপাতালে ছিলাম, বিভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধিদের জন্যই সে-হাসপাতাল নির্দিষ্ট, অথচ সেখানেও ডাক্তার-নার্সদের মধ্যে অন্য ভাষার ব্যবহার নেই বললেই চলে। আমেরিকায় ইংলণ্ডে সুইজারল্যাণ্ডে হোটেলে পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য টেলিফোন কর্মচারীরা বহু-ভাষাভাষী। মস্কোতে হোটেল দূরে থাক, বিদেশীর জন্য নির্ধারিত হাসপাতালেও ইংরাজী, ফরাসী ও জর্মন ভাষা প্রায় অচল। তার ফলে রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে আলাপও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মস্কোতে শুধু ভাষার মুশকিল রয়েছে, তা নয়। ভাবের আদান-প্রদানের মুশকিল আরো বেশি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষ বিদেশী দেখলে আগ্রহ করে আলাপ করতে আসে, তাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করে, নিজেদের দেশের কথা বলে।

মস্কোতে সাধারণ মানুষ বিদেশীর প্রতি বন্ধুত্বমনোভাবাপন্ন, এবং নানাভাবে আতিথেয়তা প্রকাশ করতে চায়। মস্কোতে আমাদের যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁদের কাছে শুনেছি যে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করবার এ-আগ্রহ সাম্প্রতিক বিকাশ। স্টালিনের যুগে ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ বিদেশীর সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে সাহস পেত না। বর্তমানে রুশ নাগরিক বিদেশীকে সম্ভাষণ করে, আদর-আপ্যায়নও করতে চায়, কিন্তু দেশ বা বিদেশের কোন সমস্যার আলোচনা করতে তারা নারাজ। ঘরোয়া কথাবার্তা খানিকক্ষণ চলতে পারে কিন্তু নিজের দেশের কোন সমস্যা নিয়ে বিদেশীর সঙ্গে আলোচনা করার রেওয়াজ নেই বললেই চলে। বহু বিষয়ে আমেরিকান এবং রুশবাসীর মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে। সে-বিষয়ে আলোচনা পরে করব। কিন্তু দিলখোলা কথাবার্তায় দু-দেশের লোকের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আমেরিকার মানুষ দু-দণ্ডের পরিচয়ের পরেই মনের গোপনতম কথা বলতে চায়, নিজের দেশের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, দোষত্রুটির নিন্দাও দরাজ গলায় করে। প্রেসিডেণ্ট থেকে আরম্ভ করে শহরের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির নিন্দা বা প্রশংসা যা মনে আসে মন খুলে বলে যায়। কেবল স্বদেশ বলে নয়, বিদেশ সম্বন্ধে মতামত জাহির করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এ-ধরনের বন্ধনহীন আলোচনায় অন্য দেশের লোক সময়-সময় বিস্মিত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বিরক্তও হয়। মস্কোতে ঠিক তার বিপরীত ব্যবহারের পরিচয় মেলে। রুশ নাগরিক দেশের গুণগান খানিকটা করে, কিন্তু সমালোচনার কথা একটিও বলবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির যে-সমস্ত ক্ষেত্রে মত-বিভেদ প্রবল বা তীব্র হতে পারে, হয় সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে চলবে, তা নইলে পুঁথির বাঁধা গত আউড়ে যাবে।

প্রায় সমস্ত আলাপ-আলোচনাই তরজমার মাধ্যমে হয় বলে রুশদেশে সত্যিকারের মন খুলে কথা বলা আরো কোঠিন। তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে এমনিতেই তেমন অন্তরঙ্গ আলাপ চলে না, দু-পক্ষই রয়েসয়ে কথা বলে এবং যা বলে তাও অনুবাদে এমনিতেই খানিকটা বদলে যায়। তার ওপর যারা তরজমা করে, তারা প্রায় সকলেই সরকারী চাকুরে। শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রেই তারা দলীয় মতবাদে গোঁড়া বিশ্বাসী। ফলে বিদেশী মন খুলে কথা বললেও যেসব কথা হয়, তা আলাপচারী রুশবাসীর কাছে পুরোপুরি

পৌঁছয় না। পৌঁছলেও রুশবাসী তার উত্তরে যে-কথা বলে, তার অনেকখানিই তরজমাকারের মন জুগিয়ে বলতে হয়। ফলে বারবার দেখেছি যে অনেক সাধারণ সমস্যায়ও লোকে স্পষ্ট জবাব দিতে চায় না, প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। একমাত্র উচ্চতম রাজপ্রতিনিধিররাই খানিকটা স্পষ্টভাবে সাহসের সঙ্গে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারেন, বাকি লোকে কঠিন সমস্যারও হয় মামুলী উত্তর নয়তো ভাসাভাসা গোঁজামিল দিতে চায়।

আমাদের দলে রুশ ভাষা বেশ ভালো জানেন এমন একজন সঙ্গী ছিলেন। তাই কোন-কোন ক্ষেত্রে তরজমার ব্যতিক্রম আমরা ধরতে পেরেছি। তিনি নিজেও সাক্ষাৎভাবে রুশবাসীর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেখানেও দেখেছি যে যতক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে আলাপ, ততক্ষণ খোলাখুলিভাবে আলাপ চলে। বাড়ি কোথায়, বাপ-মা বেঁচে আছেন তো, বিবাহ হয়েছে কিনা, ছেলেমেয়ে কয়টি, এসব প্রশ্নের আদানপ্রদান সহজ এবং অব্যাহত। কিন্তু দেশের লোকে যথেষ্ট খেতে-পরতে পায় কিনা, গত বিশ-পঁচিশ বছরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে, রাজনৈতিক দলাদলি আছে কিনা, এসব প্রশ্ন তোলাও বিপজ্জনক। আমরা অবিশ্যি রাজনৈতিক আলোচনা বেশি করিনি—সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষা পদ্ধতির বিচার করতেই আমরা গিয়েছিলাম, কিন্তু তবু যদি প্রসঙ্গত কোনো রাজনীতি বা সমাজনীতির প্রশ্ন এসে পড়েছে, বেশির ভাগ লোকেই সে-সমস্ত প্রশ্ন এড়াবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নিছক শিক্ষাসমস্যার আলোচনায়ও আমরা বার বার দেখেছি যে কোন মূলগত প্রশ্নের সোজা উত্তর বেশির ভাগ শিক্ষক বা শিক্ষাব্রতী দিতে চান না। স্কুলের ছেলেমেয়েরা যতখানি সাহসের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সে-তুলনায় অনেক বেশি হিসাব করে কথা বলে।

আমরা যখন মস্কোয় পৌঁছলাম তখন রাত্রি প্রায় বারোটা-একটা। তা সত্ত্বেও আমাদের অভ্যর্থনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং এসেছিলেন, শিক্ষাদপ্তরের মান্যগণ্য আরো কয়েকজন কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। শুনেছি যে এমনিতেই রুশবাসী অতিথিবৎসল, আমরা ভারতবাসী বলে হয়তো সে-আতিথেয়তা আরো বেশি গভীর ও আন্তরিক হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে যে পাঁচ সপ্তাহ

মস্কোতে ছিলাম, আমাদের সুখসুবিধার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ ছিল। যেভাবে তাঁরা আমাদের আদরযত্ন করেছেন, তা আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না।

সেদিন রাত্তিরে হাওয়াই আড্ডা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারিনি। পরে ফেরবার সময়ে সকালে অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম। বিরাট আড্ডা এবং নানাধরনের নানা হাওয়াই জাহাজ, কিন্তু যে-দালানে আমাদের সকলের অভ্যর্থনা ও বিদায়ের ব্যবস্থা, সে-দালানটিকে মামুলী বললে অন্যায় হবে না। বিমান চলাচলের জন্য বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, তার কোনো-কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু লোকের চোখে ধাঁধা দেবার মতন তেমন কোনো অট্টালিকা বিমানঘাঁটিতে দেখিনি। সবই ব্যবহারিক প্রয়োজন দিয়ে যাচাই হয়েছে, খালি আড়ম্বরের দিকে দৃষ্টি কম। রুশ হাওয়াই জাহাজ সম্বন্ধেও সে-কথা বলা চলে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বা আমেরিকায় যাত্রীদের মনোবিনোদনের জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থা, রুশ হাওয়াই জাহাজে তার বিশেষ কোনো পরিচয় নেই, বরং বলা চলে যে সমস্ত ব্যবস্থাই মামুলী, কিন্তু বিমান-চলাচলের তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। ইয়োরোপে আমেরিকায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায় নানা রকমের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা, গদি-আঁটা নানাধরনের বসবার আরামের সামগ্রী। রুশদেশে বিমানে খাদ্যপরিবেশনের ব্যবস্থা দেখিনি, সমস্ত খাওয়াদাওয়ার আয়োজন বিমান-আড্ডাতেই সম্পন্ন হয়েছে। বিমান সম্বন্ধে আর-একটি জিনিস প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাধারণত বিমানপোতে আরোহীদের আসনের সঙ্গে যে পেটি থাকে এবং আরোহণ-অবতরণের সময় সমস্ত যাত্রীকেই সে-পেটি বাঁধতে হয়, রুশ-বিমানে তার কোনো নিশানাই দেখিনি।

মস্কো বিরাট শহর এবং দিন-দিন আরো বড় হয়ে উঠছে। কোনো-কোনো অঞ্চলে আকাশ-স্পর্শী অট্টালিকা নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্কাই-স্ক্রেপারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কোনো কোনো-অঞ্চলে এখনও একতলা-দোতলা কাঠের বাড়ি রয়েছে। তবে সর্বত্রই নতুন নির্মাণের নিদর্শন চোখে পড়ে। বস্তুতপক্ষে সমস্ত শহরে এক বিরাট জীবনচাঞ্চল্য। পুরানো বাড়ির বদলে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ভেঙে সিধে করে বিরাট সড়কের পত্তন হচ্ছে। পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন ইমারত গড়ে উঠছে, কিন্তু এখানেও

আমেরিকার সঙ্গে মস্কোর একটা তফাত সহজেই ধরা পড়ে। আমেরিকায় পুরাতনের প্রতি বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই, পুরানোকে ভেঙে হরদম নতুন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুনকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণের পরিচয়ও সমান স্পষ্ট। নিউইয়র্কে দেখেছি যে দশবছর পূর্ণ হতে না-হতেই পুরানো দালান ভেঙে নতুন ইমারত তৈরি হচ্ছে; কারণ নতুন ফ্যাশনের নতুন বাড়ি তৈরি করলে তাতে সুখসুবিধা বেশি থাকবে, উপার্জনও বেশি হবে। আমাদের দেশে সে-ধরনের বাড়ি ভাঙবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, ইয়োরোপেও বোধ হয় সে-ধরনের বাড়ি লোকে সহজে ভাঙবে না। মস্কোতে কিন্তু পুরানো বাড়িকেও সযত্নে জিইয়ে রাখা হয়, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার জন্য দেদার অর্থ ব্যয়েও রুশ রাষ্ট্র পরাঙ্মুখ নয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি পুরানো বাড়িকে আমূল কিভাবে এক-জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মস্কোর রাস্তাগুলিও দেখবার মতন। এমন প্রশস্ত ও বিরাট রাস্তা আর কোনো শহরে বোধ হয় এত বেশি নেই। প্যারিস সম্বন্ধে বলা হয় যে প্যারিসের রাস্তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। প্রায় একশো-দেড়শো বছর আগে নেপোলিয়নের আমলে নতুনভাবে প্যারিসের রাস্তা তৈরি হয়েছিল। একশো বছর পরেও প্যারিসের রাস্তা আজও বর্তমান যুগের যানবাহনের ভার বইতে পারে। মস্কোর নতুন বড় সড়কগুলি বোধ হয় প্যারিসকেও হার মানায়। বস্তুতপক্ষে রাস্তাগুলি এত বিরাট যে তার মধ্যে ব্যক্তি একা-একা চলতে সঙ্কোচ বোধ করে। সমষ্টির মাহাত্ম্য এবং ব্যক্তির নিঃসহায়তা মস্কোর রাস্তায় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তার তুলনা বোধ হয় আর কোথাও মিলবে না।

মস্কো আটশো বছরের পুরানো শহর এবং সে-ঐতিহ্যের গর্ব ও গৌরব নানা দিকেই ছড়ানো; তবু গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে যেভাবে সমস্ত রুশ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকাশ বদলাবার চেষ্টা হয়েছে, মস্কোর চেহারা দেখলেই তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। জারদের আমলে রুশ-দেশের যে চেহারা, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। সে-চেহারা আজো একেবারে লুপ্ত হয়নি; কিন্তু যে-পরিবর্তন চল্লিশ

বৎসরে ঘটেছে তার ফলে ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাষ্ট্র আজ বহুক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রবর্তী দেশকেও ভাবিয়ে তুলেছে। কিভাবে এ-রূপান্তর সম্ভব হল সে-বিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকবে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এ-প্রগতিকে সাহায্য করেছে না ব্যাহত করেছে তা নিয়েও মতান্তর সম্ভব, কিন্তু একটি বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নেই। রুশদেশে শিক্ষাপ্রণালীর যে সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটেছে, রুশদেশের উন্নতির তাই যে প্রধানতম কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। শিক্ষায় মাধ্যমে দেশের রূপান্তর কিভাবে হয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমেরিকায় মেলে। জার্মানীতে জাপানেও শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি সবদিকেই হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ ও ব্যবস্থায় রুশদেশে যে-রূপান্তর ঘটেছে, তা বোধ হয় আরো বিস্ময়কর। রুশ-প্রগতির বুনিয়াদ যে-শিক্ষাপ্রণালী আগামীবারে তার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করব।

কার্তিক ১৩৬৪

॥ দুই ॥

প্রায় তিন বছর আগে সোভিয়েট দেশ থেকে ফিরে 'মস্কোতে পাঁচ সপ্তাহ' বলে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ রচনার পরিকল্পনা করেছিলাম। তার প্রথম প্রবন্ধ 'চতুরঙ্গে'র কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল। তারপর আর সে বিষয়ে লেখা এতদিন সম্ভব হয়নি। এবার আবার সোভিয়েট দেশ দেখবার সুযোগ যখন এল, তখন স্থির করলাম যে পূর্বের পরিকল্পিত প্রবন্ধগুলি লিখতেই হবে। তিন বছরে সোভিয়েট দেশে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে, নানাভাবে জনসমাজের জীবনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া সেবার মস্কোর বাইরে যেতে পারিনি, এবার অনেক বেশী দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেবার প্রধানত সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালী দেখতেই গিয়েছিলাম—এবার শিক্ষাপ্রণালী ছাড়াও সোভিয়েট সমাজজীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য অনেক দিক দেখেছি। 'চতুরঙ্গে' পূর্বে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাও আবার পড়লাম। তাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন করার বোধ হয় প্রয়োজন নেই, তবে সেবারের তুলনায় এবার মনে হয় যে জনসাধারণের মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেকখানি বেড়েছে।

পূর্বের প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার ও সম্প্রসারণই সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রগতির মুখ্য কারণ। এবার ঘুরে এসে আমার সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষার প্রসার কেবল সোভিয়েট বলে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির মূলে। প্রকৃতি অজস্র ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিয়েছে, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এসিয়ায়। নৈসর্গিক সম্পদে ভারতবর্ষের মতন সমৃদ্ধ দেশ পৃথিবীতে বেশী নেই। আরো এমন অনেক দেশের কথা সহজেই মনে আসে, কিন্তু প্রকৃতির এত পক্ষপাত সত্ত্বেও সে সমস্ত দেশ বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তিতে দুর্বল, শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর, এমনকি কৃষিজাত শস্যসম্পদেও পরমুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষে শতকরা ৭০।৭৫ জন লোক কৃষিনির্ভর হয়েও বিদেশী শস্য আমদানী না করলে আমাদের চলে না। সে তুলনায় এশিয়ায় জাপান বা ইয়োরোপে অনেক দেশ

প্রাকৃতিক সম্পদে হীন হয়েও সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মানব সমাজে বরণীয়। শিক্ষার প্রসারের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, যে দেশে শিক্ষা তত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে, কৃষি শিল্প বাণিজ্যে সামরিক শক্তিতে ও অর্থসম্পদে সে দেশ তত অগ্রণী।

সোভিয়েট বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ এ কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই গত চল্লিশ বৎসর ধরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে চেষ্টার বিরাম নেই। মস্কো শহরের উপকণ্ঠে টিলার উপর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে বিরাট ইমারত সম্প্রতি তৈরী হয়েছে, সমস্ত শহরে বোধ হয় তার তুলনা নেই। গতবার যখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অংশ রুশ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মিস্টার আফানসেনকোর সঙ্গে আলোচনা হয়, তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে মস্কো ইউনিভার্সিটির দালানের অবস্থান ও আয়তন দেখলেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার মর্যাদা বোঝা যাবে। মহানগরীর শ্রেষ্ঠতম ইমারত বিশ্ববিদ্যালয়, সোভিয়েট জনগণের জীবনের সবচেয়ে বেশী গৌরবের জিনিস রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার স্থান।

পাশ্চাত্য জগতে সমস্ত দেশেই শিক্ষার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে। বিলেতে ১৯৪৯ সালের অর্থবিপর্যয়ের সময়ে লেবার পার্টির শিক্ষামন্ত্রী টমলিনসন সাহেব সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারের অন্যান্য সমস্ত খরচ কমানো যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষাবাজেটে এক পেনী কমানো হবে না, কারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যবস্থা তাকে ব্যয় বলা উচিত নয়,—জাতির ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করবার জন্য জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার বললেই শিক্ষা বাজেটের ঠিক বিবরণ দেওয়া হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের জন্য যে প্রয়াস, তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসী দেশে, জার্মানীতেও ঠিক একই মনোভাব। প্রাচ্য জগতে জাপানও শিক্ষার মাহাত্ম্য পুরোপুরি মানে। এ সমস্ত উন্নত দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বলে হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্র এ বিষয়ে আরো বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছে, কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, এ সব দেশের তুলনায়ও বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র শিক্ষার ব্যাপারে বেশী আগ্রহশীল।

শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এ সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুরাগ এবং প্রত্যয় না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা বোধ হয় মনে করেন যে

শিক্ষা এবং ট্রেনিং দিয়ে মানুষের সমস্ত বৃত্তিরই বিস্ময়কর পরিবর্তন আনা সম্ভব। বাঙলাদেশে প্রবাদ আছে যে গাধা পিটে ঘোড়া হয় না—সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম লক্ষ্য যে সেই অসাধ্যই সাধন করতে হবে। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা এবং ট্রেনিং প্রায় জন্ম থেকেই স্বরু হয়, এবং মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যন্ত নাগরিককে রাষ্ট্র নানা বিষয়ে তরবিয়ত করতে থাকে।

পূর্বে যখন গিয়েছিলাম, তখন মস্কো শহরের কিণ্ডেরগার্টন দেখেছিলাম! এবার উজবেকস্থানের দুই জায়গায় শহরের বাইরে কলেকটিভ ফার্ম বা সমবেত কৃষিক্ষেত্রে কিণ্ডেরগার্টন দেখলাম। মস্কো মহানগরী বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজধানী—উজবেকস্থানে গ্রামাঞ্চলের কিণ্ডেরগার্টেনে তার তুলনায় আসবাবপত্র অনেক কম, কিন্তু কিণ্ডেরগার্টেনের মূল স্বরূপ সকল ক্ষেত্রেই এক মনে হল। দু-বছর আড়াই বছর বয়স থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের কিণ্ডেরগার্টেনে দেখলাম। মস্কো শহরে তারা বাপ-মায়ের মরজী মাফিক আসে, কলেকটিভ ফার্মে তাদের আসা প্রায় বাধ্যতামূলক। বাপ-মা দু-জনেই যেখানে ক্ষেতে খামারে বা কারখানায় কাজ করতে যায়, সেখানে শিশুদের কিণ্ডেরগার্টেনে না পাঠিয়ে উপায়ই বা কি?

সকাল সাড়ে সাতটা আটটায় শিশুরা বাড়ী থেকে আসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটায় বাড়ী ফিরে যায়। প্রাতরাশ থেকে স্বরু করে সান্ধ্যভোজন পর্যন্ত সারাদিনের খাওয়া-দাওয়া তারা স্কুলেই করে, কাজেই বাড়ীর সঙ্গে ঘুমোনো ছাড়া তাদের অন্য বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। কিণ্ডেরগার্টেনে মামুলী ধরনের লেখাপড়া বা আঁক শেখানো হয় না বটে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকা, নিজেদের জিনিসপত্র ঠিক রাখা, পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন এসব সামাজিক ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা রয়েছে, সকালে বিকালে তারা সবাই খানিকক্ষণ ঘুমোয়, দলবেঁধে সবাই দেশ-বিদেশের রূপকথা শোনে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতাদের জীবনী ও প্রশংসা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের কীর্তিকলাপ তাদের বলা হয়, শৈশব থেকেই রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা তাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। দরিদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের এসব কিণ্ডেরগার্টেনে যে ধরনের

খোরাক পোশাক খেলাধূলার সুযোগ মেলে, নিজেদের বাড়িতে তা কোনদিনই সম্ভব হত না। অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এ ব্যবস্থার ফলে সকলের সঙ্গে একই ভাবে মিলেমিশে থাকবার সুযোগ পায়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন স্তরের ছেলেমেয়েদের এ রকম মেলামেশার ফলে জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়, দেশভক্তি বাড়ে, কিন্তু পারিবারিক সম্বন্ধ অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিশোর ও যুবকদের মনে মাতাপিতা বা আত্মীয়স্বজনের জন্য যে প্রীতি, দেশভক্তির তুলনায় তা যে অনেক ক্ষীণ, শিশু শিক্ষা-ব্যবস্থা বোধ হয় তার অন্যতম কারণ। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এ ধরনের কিণ্ডেরগার্টেনের ব্যবস্থা হয়েছে।

সাত বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখানোর দিকে ঝোঁক বেশী নেই, তাছাড়া একমাত্র কলেকটিভ ফার্ম ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে সব শিশুরা কিণ্ডেরগার্টেনে আসে না। সাত বছর থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা কিন্তু সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বর্তমানে কুড়ি কোটির একটু বেশী, কাজেই প্রায় চার কোটি সাড়ে চার কোটি বালকবালিকা বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় চল্লিশ কোটি, অথচ আজও ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোটে আড়াই কোটি পৌনে তিন কোটি।

সোভিয়েট প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক বিষয় পড়তে হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীর তফাত সুস্পষ্ট। আমেরিকায় প্রায় প্রথম থেকেই শিশুদের পছন্দ অপছন্দের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, বারো তেরো বছরের শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান অথবা কোন চারুকলা শিক্ষার দিকে কমবেশী জোর দিতে পারে—কোন কোন ক্ষেত্রে দু-একটি বিষয় বাদও দিতে পারে। সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীতে শুধু প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক শিক্ষায়ও এ ধরনের পছন্দ অপছন্দের স্থান নেই। নেপোলিয়ন ফরাসী দেশে যে শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যে ফরাসী নাগরিকের কর্তব্যপালনের জন্য যা কিছু শেখা প্রয়োজন, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই বাধ্যতামূলকভাবে তা শিখতে হবে। সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থায়

নেপোলীয়নের এ নীতিকে আরো প্রসারিত করে প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, চারুশিল্প, এমনকি মার্ক্সীয় দর্শনও শেখানো হয়।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বয়সে বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হয় বোধ হয় অন্য কোন দেশে তার নজীর মেলে না। নয় বছর বয়সে শিশুরা প্রাণিবিজ্ঞান বা বায়োলজি, দশ বছর বয়সে ফিজিক্স এবং এগারো বছর বয়সে কেমিষ্ট্রি পাঠ শুরু করে। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত যারা কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে না, তারাও পাঁচ বছর বায়োলজি, চার বছর ফিজিক্স এবং তিন বছর কেমিস্ট্রি পড়ে। ফলে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কোটি কোটি লোক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, সমাজের প্রত্যেকটি লোক বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় মানুষ বলেই সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ বিজ্ঞানে অসাধারণ অগ্রগতি দেখিতেছে।

১৯৫৬ সালে যখন মস্কো গিয়েছিলাম, শুনেছিলাম যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ সাত বছর থেকে বাড়িয়ে দশ বছর করা হবে। তখন দু-একজন সোভিয়েট শিক্ষাবিদ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ মোটে ষোল বছর বয়সে শেষ হয়ে যায়, কাজেই সাত থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীতে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করবে। তখন এ কথাও শুনেছিলাম যে দশ বৎসরের এ নতুন বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা মস্কো লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি বড় শহরে চালু হয়ে গিয়েছে, এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা ছড়িয়ে পড়বে।

এবার গিয়ে দেখলাম যে এ পরিকল্পনা কেবলমাত্র পরিকল্পনাই রয়ে গেছে, বাস্তবে পরিণত হয়নি। কয়েক মাস আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাত থেকে চোদ্দ বছরের বদলে সাত থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সুরু হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত সাতসালা প্রাথমিক শিক্ষার বদলে ভবিষ্যতে আটসালা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হবে। আটসালা প্রাথমিক শিক্ষার পরে ছাত্রছাত্রীদের দু-বছর ক্ষেতে-খামারে বা কারখানায় কাজ করতে হবে, এবং এইভাবে পূর্বে

পরিকল্পিত বাধ্যতামূলক দশসালা শিক্ষাব্যবস্থার ঘোষণার সঙ্গে বাস্তব ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হচ্ছে। দশসালা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার বদলে আটসালা শিক্ষার ব্যবস্থা কেন প্রবর্তিত হল, সে বিষয়ে এবার অনেক শিক্ষাবিদকে জিজ্ঞাসা করেছি। বেশীর ভাগই প্রথমে বলেছেন যে দশ বছর স্কুলে পড়ার চেয়ে আট বছর স্কুলে পড়ে দু-বছর কোন কাজ করলেই শিক্ষার উৎকর্ষ হবে। এ কথার উত্তরে যখন বলেছি যে আট বছরের শিক্ষাব্যবস্থা কোনক্রমেই দশ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আর হাতে-কলমে কাজের ব্যবস্থা দশ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরেও করা যায়, তখন দু-একজন সোভিয়েট শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন যে স্কুলঘর, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলেই দশসালা পরিকল্পনার বদলে আটসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ এক বছর বাড়াবার অর্থ প্রায় ষাট সত্তর লাখ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি। তিন বছর মেয়াদ বাড়লে প্রায় দু-কোটী নতুন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মতন বিরাট দেশের পক্ষেও হঠাৎ এত বেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

সোভিয়েট শিক্ষাবিদদের এ যুক্তি না মেনে উপায় নেই। বিলাতে যখন শিক্ষার মেয়াদ চোদ্দ থেকে বাড়িয়ে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত করা হয়েছিল তখন সেখানেও এ সমস্যা উঠেছিল। ভারতবর্ষের কোন কোন রাষ্ট্রে চারসালা প্রাথমিক শিক্ষার বদলে পাঁচসালা প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে কম বেগ পেতে হয়নি। তবে এ কথাও আমার মনে হয়েছে যে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনায় এ পরিবর্তনের মূলে আর একটি কারণও রয়েছে। আঠারো-উনিশ বছর বয়স না হলে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা নেই বলে অল্পদিন আগে পর্যন্তও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার শেষে অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার চেষ্টা না করে কোন না কোন কাজে লেগে পড়ত। গত পাঁচ ছয় বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি বেড়েছে, ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার শেষে যারা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করতে চায় তাদের অনুপাত এবং সংখ্যা দুই-ই বেড়েছে: বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যারা আসে, তাদের দাবী মেটানো দিন

দিন এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উমেদার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এত বেড়ে যেত, যে তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাই সোভিয়েট রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত ধার্য করেছে, এবং মনে হয় এ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে অন্তত তিন-চার বছর সময় লাগবে। মহাযুদ্ধের শেষে বিলাতে যখন বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ চোদ্দ থেকে বাড়িয়ে পনেরো করা হয়, তখন সেখানেও দু-এক বছরে এ পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত ভেদ স্বীকার করা হয়নি। চোদ্দ থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর। পুরো পাঁচ বছরই প্রাথমিক শিক্ষার মতন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্ত বিষয়ই সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়। আমেরিকার শিক্ষা প্রণালীতে এ স্তরে যে বৈচিত্র্য ও ছাত্রছাত্রীদের মরজী মোতাবিক বিষয়ে নির্বাচনে যে স্বাধীনতা, সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষায় তার কোন নিদর্শনই মিলবে না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন ও কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস পড়তে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীর চর্চাও প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয়। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের সুযোগ সকলের মেলে না বলে এ স্তরে ছাঁট-বাছাই প্রতিপদে করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ বৎসর হয়তো ষাট সত্তর লাখ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পৌঁছয় কিন্তু তাদের মধ্যে বছরে দশ পনেরো লাখের বেশী ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে স্থান পায় না। যারা জায়গা পায় তাদের মধ্যেও যদি কেউ কোন সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের অনুপযোগী বিবেচিত হয়, তবে তার পাঠ্যজীবন তখুনি শেষ হয়ে যায়। সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাঁচসালা মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী তাই বড়জোর সত্তর-আশী লাখ। পাঁচ বৎসরের শেষে তাদের মধ্যে খুব বেশী হলে দশ পনের লাখ ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

একে তো রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একই দলের হাতে, সেদিন পর্যন্তও

রাষ্ট্রের কোন ব্যবস্থার সমালোচনা করবার সুযোগ ছিল না বললেই চলে, তার উপর পাঠ্যক্রমের বিরাট বোঝা, প্রত্যেক বিষয় শিক্ষালাভ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনে ভয় যে লেখাপড়ায় বিন্দুমাত্র গাফিলতী হলে পাঠ্যজীবন শেষ হয়ে যাবে। ফলে সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষার্থী যেভাবে পরিশ্রম করে সমস্ত বৎসর সমস্ত বিষয়ে পাঠে মনোযোগ দেয়, অন্য দেশে সহজে তার তুলনা মিলবে না। ছাত্র অসন্তোষ বা ছাত্র বিক্ষোভের সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই কোন অবকাশ নেই।

পূর্বেই বলেছি নেপোলিয়নের আদর্শ ছিল যে প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে নেপোলিয়নের এ আদর্শ ছাড়াও তরুণ যুবক যুবতীদের সমস্ত উদ্যম শিক্ষাক্রমে আবদ্ধ রাখবার জন্যই সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষা এত কঠোর। শিক্ষার্থীদের জাগ্রত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্মব্যস্ত বলে অলস ক্ষণের কোন অলস চিন্তা বা সময়ের অপব্যবহারের কথা তারা ভাবতেই পারে না।

সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষায় যে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক প্রসার, তারও কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। সঙ্গীত, শিল্প, নাট্যকলা বা শরীর চর্চার জন্য বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষালয় এখানে ওখানে মেলে, কিন্তু এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাধ্যমিক সঙ্গীত শিক্ষালয়ে বড়জোর হাজার দশেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে, শিল্প, নাট্যকলা বা শরীর চর্চার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও তার চেয়ে বেশী হবে না। যারা এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করতে চায়, তাদের বেলায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে হয়। ফলে শিল্পকলা, সঙ্গীত বিজ্ঞান অথবা টেকনিক, সমস্ত ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা একই ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করেছে বলে সমাজজীবনে তাদের স্থান নির্ণয় অনেকটা সহজ হয়ে দেখা দেয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ছাঁট-বাছাই প্রচুর। কাজেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ যে আরো কঠিন হবে, তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে, উচ্চশিক্ষার স্তরে সোভিয়েট রাষ্ট্র অধিকার ভেদে বিশ্বাসী। প্রায় দশ-পনেরো লক্ষ শিক্ষার্থী প্রতি বছর মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে, তাদের

মধ্যে প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত কিন্তু বড়জোর দু-লক্ষ তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়। প্রবেশের পরেও শিক্ষার্থী জীবনের চার পাঁচ বৎসর প্রতিক্ষণই তাদের শিক্ষালাভের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়, যদি কোন কারণে কাউকে অযোগ্য মনে হয়, তার শিক্ষার্থী জীবন তখনই শেষ হয়ে যায়। স্কুল-জীবনের শেষে আমাদের দেশে যেভাবে নির্বিচারে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে চায়, যারা কোনক্রমে কষ্টেসৃষ্টে তৃতীয় ডিভিশনে পাস করেছে তাদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দাবী করা হয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা কেউ কখনো করতে পারে না। আমাদের দেশে কেউ যদি সাতবার চেষ্টার ফলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়, আবার পাঁচ-সাতবার আই-এ ফেল করে অবশেষে দশ বার বছর পরে বি-এ পাস করে, আমরা তার অধ্যবসায়ের তারিফ করি। বিলেতে ডিগ্রীলাভের জন্য শিক্ষার্থী বড়জোর দু-বার চেষ্টা করতে পারে, দ্বিতীয়বারে সফল না হলে তার আর কোনদিনই ডিগ্রী মেলে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহুক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার চেষ্টার অবকাশও নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মিস্টার এলুটিন পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নয়, বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্রে যারা অগ্রণী, তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার আছে। তাঁর মতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে দেশের জনসাধারণের অর্থের এবং এ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সময়ের অপচয়।

উচ্চশিক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের ছাঁটবাছাই করা হয়। মাধ্যমিক সঙ্গীত শিক্ষালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করে, কিন্তু উচ্চশিক্ষায়তনে তাদের সংখ্যা সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে হাজারও হবে না। নাট্যকলার ক্ষেত্রে মস্কোর লুনাচার্স্কী ইনস্টিটিউটে সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে বছরে একশো, অর্থাৎ পাঁচ বছরে মোটে পাঁচশো শিক্ষার্থী নেওয়া হয়। সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে বছরে আন্দাজ দু-লাখ বা পাঁচ বছরের সমস্ত ছাত্র মিলিয়ে সবসুদ্ধ মাত্র দশ লাখ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাছাড়া যাদের উচ্চশিক্ষায়তনে স্থান মেলে, প্রথম বছরে তাদের উপরও কড়া নজর রাখা হয়, এবং কোনভাবে অনুপযোগী মনে হলেই তাদের ছেঁটে ফেলা হয়। মিস্টার এলুটিন বললেন যে প্রথম বছরের পরে যারা টিকে যায়, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠ্য জীবন শেষ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য ধরনের উচ্চ শিক্ষায়তন থেকে যারা পাস করে বেরোয়, তাদের সকলকে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সকলে কিন্তু পছন্দমত কাজ পায় না। শিক্ষার্থীকে যে কাজ দেওয়া হয় তা নিতে সে কখনো কখনো আপত্তি এবং দু-এক ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার করে। সে সব ক্ষেত্রে তাদের প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়, বলা হয় যে বর্তমানে অন্য কোন ধরনের কাজ নেই, এবং যে কোন কাজ গ্রহণ করলেই তাতে কৃতিত্ব দেখবার সুযোগ মিলবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোন শিক্ষার্থী কাজে যোগ না দেয়, তখন আর তার বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে প্রতি বছরই এ রকম ঘটনা কিছু কিছু ঘটে।

উচ্চশিক্ষার বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী আরো ভাল করে বোঝবার জন্য মিস্টার এলুটিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে প্রতি বছরই যখন সমস্ত হিসাবে উপযুক্ত প্রায় আট লাখ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায় না, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ বিচিত্র নয়, সেজন্য রাষ্ট্র কি কোন ব্যবস্থা দরকার মনে করে না? মিস্টার এলুটিন বললেন যে সব ছাত্রই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে উৎসুক নয় অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কাজ চায়। যদি সকলে স্থান না-ও পায় তবে তাতে দুঃখ করে লাভ নেই, দেশের সমগ্র জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় করার চেয়ে দু-এক লাখ ব্যক্তির আশাভঙ্গ করাই বোধ হয় সমাজের পক্ষে বেশী কল্যাণকর। তবে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহশীল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায় না, তাদের এ ব্যাপারে হতাশ হবার কারণ নেই। তারা কাজ করতে করতেও হয় সান্ধ্য বিদ্যালয়ে বা করেসপণ্ডেন্স কোর্সে যোগ দিয়ে উচ্চশিক্ষালাভ করতে পারে। তাতে অবশ্য দু-তিন বছর সময় বেশী লাগে, কিন্তু কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ করে বলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা বেশী কার্যকরী হয়। মিস্টার এলুটিনের মতে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য ধরনের উচ্চশিক্ষায়তনে যোগ না দিয়েও এভাবে উচ্চশিক্ষালাভ করেছে এবং এ ধরনের ব্যবস্থা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই বেশী কল্যাণকর।

শ্রাবণ ১৩৬১

॥ তিন ॥

সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর বিষয়ে খানিকটা আলোচনা আগেই করেছি। আসলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত বিষয়েই শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এর উপরে ঝোঁক এত বেশী যে সোভিয়েট জীবনের যে কোন বিষয় আলোচনা করতে হলেই শিক্ষার কথা বলতে হবে। জন্ম থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিককে রাষ্ট্র সচেতন ও সংঘবদ্ধভাবে শিক্ষা দান করে, তাই সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শিক্ষার একটি বিরাট লেবরেটরী বললে অন্যায় হবে না। কিছুদিন আগে লাইসিঙ্কোকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক আলোচনা বিতণ্ডা হয়। লাইসিঙ্কোর মূল বক্তব্য ছিল যে শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান বাড়ানো ছাড়াও তার প্রকৃতি ও স্বভাবেরও আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব এবং সে পরিবর্তন পরবর্তী পুরুষেরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। শিক্ষার ফলে যে ব্যক্তির ব্যবহারে পরিবর্তন হয় একথা সবাই মানেন, কিন্তু ব্যক্তির স্বরূপ বদলে যায় এবং সে পরিবর্তন বংশানুক্রমে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয়, একথা অনেকেই মানতে পারেন নি। লাইসিঙ্কোর মতামত সত্য কিনা তা নিয়ে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এ মতবাদ যে সোভিয়েট জীবন দর্শনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং শিক্ষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ফলেই তার বিকাশ একথা অনস্বীকার্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বিক ও বাধ্যতামূলক সেকথা আগেই বলেছি, বর্তমানে সার্বিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে পনেরো করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই কোন না কোন কাজে লেগে যায়, শতকরা কুড়ি পঁচিশজন ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থী বাছাই হয় বলে বুদ্ধি বা বিদ্যায় দুর্বল ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যায়তনে স্থান পাওয়া আরো বেশী কঠিন এবং

প্রবেশলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবার জন্য এ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই যারা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে, তাদের মধ্যে শতকরা তিন চারজনের বেশী উচ্চ শিক্ষায়তনে প্রবেশ করবার অধিকার পায় না।

মাধ্যমিক স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের স্থান মেলে না, তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। নানা ধরনের সান্ধ্য, নৈশ বা অর্ধসাময়িক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা রয়েছে এবং কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এ সমস্ত কোর্সে যোগ দেওয়া চলে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষালয়ে না গিয়ে বাড়ীতে বসেই চিঠিপত্রের সাহায্যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ধরনের নানাপ্রকার পাঠক্রমের প্রবর্তন বোধহয় আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। কেবল সোভিয়েট রাষ্ট্র বলে নয়, বিলাতে এবং মার্কিন দেশেও এরকম অর্ধ সাময়িক কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। আমেরিকাতেই এরকম ব্যবস্থা প্রথম স্থরু হয়, কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার প্রসার বোধহয় আমেরিকার মতনই ব্যাপক। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখও হবে না, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অর্ধ সাময়িক পাঠক্রমে যোগদান করে প্রায় বিশ লক্ষ লোক। সোভিয়েট রাষ্ট্রেও যারা মাধ্যমিক স্কুল বা উচ্চশিক্ষায়তনে স্থান পায় না তাদের মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোন ধরনের অর্ধ সাময়িক কোর্সে যোগ দেয়। কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, চারুকলা প্রভৃতির ব্যবস্থা তো রয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বর্তমান যুগের উপযোগী যে কোন শাস্ত্রের অধ্যয়নেই এ ধরনের শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি স্থযোগ দেওয়া হয়।

সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখও বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পরে যদি কোন যুবক বা যুবতী রাষ্ট্রের সংগঠনমূলক কোন কাজে যোগ দেয়, তবে দু-তিন বছর পরে তারা অপেক্ষাকৃত সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে পারে। সোভিয়েট উচ্চশিক্ষা-মন্ত্রী আমাকে জানান যে মেধাবী ছাত্রছাত্রীও বহুক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলের শেষে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা না করে রাষ্ট্রগঠন কার্যে যোগ দেয়, কারণ দেখা গেছে যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায়তনে প্রবেশের কড়াকড়ি এত বেশী যে সে তুলনায় এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ অনেকটা সহজ।

সোভিয়েট শিক্ষাবিদ্ এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু এ ব্যবস্থার বিরোধী। তাঁরা বলেন যে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে প্রথম যৌবনের প্রতিভাদীপ্ত দু-এক বছর এভাবে নষ্ট করলে সোভিয়েট বিজ্ঞান অন্যদেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। আমেরিকাতেও বহু শিক্ষাশাস্ত্রী এবং বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে একমত।

বিজ্ঞানের উপরে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থায় যে ঝোঁক, তার উল্লেখ আগেই করেছি। প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরাও সুরু থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করে, তাই বর্তমানে বিজ্ঞানের মূলসূত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়, চল্লিশ বছর বয়সের অনধিক এ রকম সোভিয়েট নাগরিক নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানের এই বিপুল প্রসারের ফলেই সম্প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত প্রগতি করেছে, এবং মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক-মনোবৃত্তি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে আগামী দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি বা দর্শন কোন ক্ষেত্রেই আর কেবল পুঁথির নজীর দিয়ে জনসাধারণের মতবাদ বা চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। এ প্রশ্ন সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহুবার আমিও করেছি। শিক্ষায়তনে, বৈজ্ঞানিক সংসদে, দর্শনসভায়, লেখকগোষ্ঠীর আলোচনায় বহুবার প্রশ্ন করেছি যে বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র জিজ্ঞাসা ও বিচার। সমস্ত জিনিসই যদি বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়ে মানুষ একবার বিচার করতে সুরু করে, তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মূলনীতি মার্ক্সবাদ নিয়েও নতুন যুগের শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য। বর্তমানে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এক দলের সর্বনায়কত্ব, মার্ক্সবাদে সন্দিহান হলে তার সামাজিক বা চিন্তাজগতে স্থান নেই বললেই চলে, বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসাবাদ ও সব কিছু বিশ্লেষণ করবার মনোভঙ্গির সঙ্গে তার সঙ্গতি কই, এ কথা জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ লোকেই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন, বলেছেন যে মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানসম্মত, তাই মার্ক্সবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু উত্তরে যখন জিজ্ঞাসা করেছি যে বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত নিয়েও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বারবার বিচার করেছেন বলেই আধুনিককালে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রগতি এবং যেদিন এ ধরনের অবারিত প্রশ্নকে বাধা দেওয়া হবে, সেদিনই বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে আসবে, তখন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা লেখক গোষ্ঠীর কাছে কোন সদুত্তর পাইনি। রাষ্ট্রনেতারা বরং এ বিষয়ে

অপেক্ষাকৃত উদার ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন যে আমাদের লক্ষ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের উন্নতি, সোভিয়েট নাগরিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দ্বারাই সে শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব, তাই নাগরিকের বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। শিক্ষার প্রসারের ফলে আজ পর্যন্ত কিন্তু রাষ্ট্রের মূলনীতি নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি—যদি ওঠে, যখন ওঠবে, তখন দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে সোভিয়েট নেতা মিঃ ক্রুশ্চভের চিন্তা, কথা ও ব্যবহারে যে বাস্তববোধের পরিচয় মেলে, অধিকাংশ সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার একান্ত অভাব।

সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক, অন্যদিকে তেমনি ভাষা শিক্ষার উপরেও প্রচুর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে সাধারণত কেবল মাতৃভাষাই শেখানো হয়, কিন্তু যাদের মাতৃভাষা রুশ নয়, মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রুশ ভাষাও পড়তে হয়। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা। লেনিনের আমলেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বহুল পরিমাণে সোভিয়েট রাষ্ট্র এ আদর্শকে কার্যকরী করেছে।

কার্যত যাই হোক না কেন, আইনত সোভিয়েট রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। এ সমস্ত রাষ্ট্রেই নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সে শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে স্বরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। কার্যত কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রুশ ভাষা ধীরে ধীরে অন্যভাষার ওপর প্রাধান্য লাভ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে এ সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের রুশ ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছে। রুশভাষী শিশুরা কিন্তু অন্য কোন ভাষা সাধারণত শেখে না। কাজেই পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তারা বেশী মনোযোগ দিতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পাঠক্রমের ব্যবস্থায় এ অসঙ্গতি আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ স্তরে অন্য ভাষাভাষীদের বাধ্যতামূলকভাবে রুশভাষা শিখতে হয়, এবং

তার জন্য যে পরিমাণ সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, পাঠ্য অন্যান্য বিষয়ের সময় কমিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে দেখা যায় যে বহুক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে মেধাবী বালকবালিকা স্বভাষী স্কুলে না গিয়ে রুশভাষা যে সব স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম, সে রকম স্কুলে যেতে চায়।[1] রাষ্ট্রভাষার আকর্ষণ এমনিতেই প্রবল, তার উপর সোভিয়েট রাষ্ট্রে যেসব ভাষা প্রচলিত, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই রুশভাষার তুলনায় সাহিত্যে বিজ্ঞানে অনগ্রসর ও দরিদ্র বলে মেধাবী ছাত্রের মনে রুশভাষার প্রতি বেশী আগ্রহ হওয়াও বোধ হয় স্বাভাবিক।

রাষ্ট্রভাষার প্রতি এ আগ্রহ আমরা ভারতবর্ষেও দেখেছি। পাঠান মোগল রাজত্বকালে ফারসী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজি যেভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করেছে, আজ যদি সোভিয়েট রাষ্ট্রে রুশভাষা তেমনিভাবে অন্য ভাষাভাষী নাগরিকদের আকর্ষণ করে, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। রুশভাষার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান-জাগতিক প্রাধান্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রের অন্যান্য ভাষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে চেষ্টা, তাদের মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা, তার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের বরং আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে হয়।

ভারতবর্ষেও বহু ভাষার বিকাশ এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে কোন একটিকেই প্রধান বলা চলে না। এত ভাষা বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা দেশের ঐক্য কিভাবে সংরক্ষণ করি, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করি, একথা সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা আমাকে তাই বহুবার জিজ্ঞাসা করেছেন। উত্তরে যখন বলেছি যে আমাদের সংবিধানে চোদ্দটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র সরকারী কাজকর্মের সুবিধার জন্য হিন্দীভাষাকে সরকারীভাষার স্থান দেওয়া হয়েছে, তখন তাঁরা বলেছেন যে আমাদের নীতিও তাই, কিন্তু কার্যত নানা কারণে রুশভাষা অন্যভাষার তুলনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষায় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশ পনেরোখানি বই ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত ভাষায় অনুবাদ করে সর্বভারতীয় সাহিত্য রচনার যে চেষ্টা আমরা করছি, সোভিয়েট রাষ্ট্রে সে ধরনের পরিচয় আরো ব্যাপকভাবে মেলে। সোভিয়েট মন্ত্রীর মতে তাঁদের দেশে প্রায় আশীটি ভাষার প্রচলন, এবং যে

কোন ভাষায় কোন ভাল বই রচনা হলে তখুনি অন্যান্য ভাষায় তার অনুবাদের ব্যবস্থা হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বললেন যে দাগিস্তানের দু-জন কবি বর্তমানে সমস্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে খ্যাতিলাভ করেছেন, অথচ তাঁরা যে ভাষায় লেখেন, সে ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা বড় জোর লাখখানেক হবে। রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্যের ফলে বহুভাষা যে এভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে ও করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সমর্থনে বিপদও রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা পরে করব।

বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষা শেখবার যে ব্যবস্থার ও আগ্রহ সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখা যায় তাও প্রশংসনীয়। রাশিয়ানরা চিরদিনই ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে তিন চারটি ভাষা বলতে না পারলে রুশ দেশে ভদ্রসমাজে স্থান পাওয়াই কঠিন ছিল। বস্তুত, এককালে রুশ ভদ্রলোক বাড়ীতে ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ফরাসীভাষায় কথা বলে গর্ব বোধ করতেন সঙ্গে সঙ্গে জার্মান, ইংরেজি, ল্যাটিন এবং অন্যান্য ভাষারও রেওয়াজ ছিল। বর্তমানেও বিদেশী ভাষা শিক্ষায় নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়—ছাত্র ও শিক্ষক, রাজকর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক, রাষ্ট্রনেতা ও রাজনৈতিক সবাই কোন না কোন বিদেশীভাষা শিখতে চান, এবং সমস্ত বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজি শেখবার আগ্রহই সবচেয়ে বেশী মনে হল। বস্তুত ইংরেজি যেভাবে সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে মনে হয় যে দশ পনেরো বছরের মধ্যে ইংরেজিভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে যাঁরা ইংরেজি জানেন, একটি রুশ কথা না জানলেও তাঁরা সর্বত্র অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারবেন।

ভারতবর্ষেও আমরা দেখেছি যে বহু সভাসমিতিতে রুশ আগন্তুক ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতা বা আবৃত্তি করে সমবেত জনগণের হৃদয় সহজেই জয় করেন। মনে হয় যে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ভিন্ন সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবেও বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপর এত জোর দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এশিয়া বা ইয়োরোপের বিভিন্ন আধুনিক ভাষার উপর যতখানি ঝোঁক, প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক ভাষায় উপর ততটা জোর দেওয়া হয় না। এককালে সংস্কৃত, আরবী, পালি বা ফারসীভাষায় রুশ মনীষীদের পাণ্ডিত্য সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

ওলডেনবুর্গ বা চেরবাটস্কীর নাম এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। আজ কিন্তু ঠিক সে ধরনের মহাপণ্ডিত সোভিয়েট রাষ্ট্রে বেশী মিলবে না। বর্তমান যুগে সোভিয়েট পণ্ডিতদের দৃষ্টিও সংস্কৃতি, দর্শন বা সাহিত্যের বদলে অর্থনীতি, রাজনীতি ও আধুনিক ভাষার দিকে বেশী ঝুঁকেছে।

বিদেশী ভাষা শিখবার ও শেখাবার ব্যবস্থা ও আগ্রহ দেখে কিন্তু বিস্মিত হতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে একটা বিদেশীভাষা শেখা বাধ্যতামূলক। পৃথিবীর বহুদেশেই এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু প্রায় সব দেশেই মাধ্যমিক স্কুলের বালক বালিকারা নেহাত দায়সারাভাবে বিদেশী ভাষা শেখে। ইংরেজ ছাত্রদের ফরাসী বা জার্মান জ্ঞান, অথবা ফরাসী জার্মান ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞানের চেয়েও শোচনীয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিন্তু তা নয়। মাধ্যমিক স্কুলে প্রথম প্রবেশের জন্য এবং পরে টিকে থাকবার জন্য যে কঠোর প্রতিযোগিতা, তার ফলে কোন বিষয়কেই অবহেলা করা চলে না। মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরাও তাই বিদেশীভাষা যত্ন করে শেখে এবং প্রথম থেকেই আধুনিক কথ্য ভাষার ওপর জোর দেওয়া হয় বলে তারা মোটামুটিভাবে নিজেদের মনোভাব সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।

শুধু তাই নয়। বিদেশীভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র ইংরেজি, জার্মান এবং ফরাসী ভাষার মাধ্যমে মস্কোতে তিনটি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে—এ তিনটি স্কুলে ইংরেজি, ফরাসী বা জার্মান কেবল যে ভাষা হিসাবে শেখানো হয় তা নয়—পাঠ্য সমস্ত বিষয়ই সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলেও বিদেশীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুলে স্প্যানিশ, আরবী, উর্দু ও হিন্দী শেখবারও ব্যবস্থা আছে। দু-চারটি স্কুলে বাঙলা, তেলেগু, মারাঠী, পাঞ্জাবীও শেখানো হয়। উজবেকস্থান প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রে ফারসীর এখনও প্রচুর কদর, তাই সে সব জায়গায় ফারসী পড়াবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাদা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

বিদেশী ভাষা শেখার জন্য শিক্ষার্থী কিভাবে নির্বাচিত হয় জিজ্ঞাসা

করে জানলাম যে প্রাথমিক স্তরে নির্বাচনের কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। অবস্থান, শিক্ষক পাওয়ার স্থবিধা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক স্কুলে বিদেশীভাষা শিক্ষার আয়োজন করা হয়। সে সব স্কুলে যে সব ছাত্রছাত্রী আসে, তারা স্বভাবতই সেই বিদেশী ভাষা শিখবার স্থযোগ পায়। মাধ্যমিক স্কুলে বিদেশী ভাষা শিখতে চাইলে তার জন্য ছাঁটবাছাই করা হয় এবং মস্কোতে যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে চালিত মাধ্যমিক স্কুল, তাতে ভর্তি হতে হলে সেই বিদেশীভাষায় বিশেষ যোগ্যতা দেখাতে হয়। বর্তমানেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিদেশীভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট। নতুন ব্যবস্থায় বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সমস্ত পাঠ্য বিষয় পড়ানো হবে এবং তার ফলে প্রতি বৎসর সোভিয়েট রাষ্ট্রে দুশো-তিনশো শিক্ষার্থী একটি বিদেশী ভাষা প্রায় মাতৃভাষার মতন আয়ত্ত করতে পারবে। শুনলাম যে হিন্দী, উর্দু এবং বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য মাধ্যমিক স্কুলও শীঘ্রই বোধ হয় তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পূর্বেই বলেছি যে সমস্ত ব্যাপারেই সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। সর্বসাধারণের জন্য নানা স্তরে শিক্ষা প্রসারণের চেষ্টা তো চলছেই, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যশিল্প, ভাস্কর্য এমন কি সার্কাস শিল্পে শিক্ষাদানের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেখকদের জন্যও বহু সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এসব সংস্থা অবশ্য লিখতে শেখায় না, কিন্তু যারা লেখে তাদের রচনার সমালোচনা করে এবং প্রকাশ ব্যবস্থায় তাদের হাত রয়েছে বলে পরোক্ষভাবে সাহিত্য সৃষ্টিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এর সঙ্গে সংগঠনের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে, তাই জীবনের প্রায় সমস্ত প্রকাশকেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মানতে হয়। এ ব্যবস্থায় লাভ-লোকসান দুই-ই রয়েছে—সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব। প্রথমে সাহিত্য শিল্প শিক্ষা দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সমস্ত সংগঠন কি রূপ নিয়েছে, তার খানিকটা বর্ণনা প্রয়োজন।

সমস্ত ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিতে এ সমস্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাও যথেষ্ট নয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন উচ্চ শিক্ষায়তনে শিক্ষা সমাপ্ত না করলে এ সমস্ত সংস্থায়

যোগ দেওয়া যায় না। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি দৃশ্যমান চারুশিল্পের জন্য আর্ট আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আকাদমীর নিজের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পায়তনে শিল্পীরা শিক্ষা পায়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করলেই তবে এ সমস্ত শিক্ষায়তনে প্রবেশের অধিকার জন্মে। সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পরে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা আকাদমীর সনদ পায়—সে সনদ না পেলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কোন মাধ্যমিক স্কুলেই শিল্পশিক্ষকের কাজ মিলবে না। মাধ্যমিক স্কুলে যারা চিত্রশিল্প শেখে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু এসব শিল্প শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার।

নাট্যশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থায় সেই একই অবস্থার পরিচয় মেলে। মস্কোতে লুনাচার্স্কী ইনস্টিটিউটে সারা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে বছরে মাত্র একশো শিক্ষার্থীকে স্থান দেওয়া হয়, পাঁচ বছরের কোর্স মিলিয়ে সমস্ত শিক্ষায়তনে মোট শ পাঁচেক ছাত্রছাত্রী। সারা সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই নাট্যশাস্ত্র শিল্পীর সংখ্যা দু-চার হাজারের বেশী হবে না এবং ফলে পাঁচ বছর শিক্ষার পরে যখন সনদ মেলে, তখন কাজ পেতে তাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। তা সত্ত্বেও প্রতি বছরই কিছু কিছু শিক্ষার্থীকে নিয়ে মুশকিল হয়, কারণ সব সময়ে কাজ তাদের পছন্দ মত হয় না, এবং যে কাজ তাদের নিতে বলা হয় তা যদি তারা একবার নামঞ্জুর করে, তখন অন্য কোন কাজ খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের নিজেদের। যেখানে প্রায় সমস্ত কাজের ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের হাতে, সেখানে নিজের চেষ্টায় বা তদ্বিরে মনমত কাজ খুঁজে পাওয়া যে কি কঠিন তা সহজেই বোঝা যায়।

যেমন নাট্যকলা বা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের বেলায়ও ঠিক সেইভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা, ট্রেনিং ও সংগঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মামুলী মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা তো রয়েছেই, তাছাড়া বিশেষভাবে সঙ্গীত শেখাবার জন্যও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা কম নয়। এ ধরনের স্কুলে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে, কিন্তু সোভিয়েট সঙ্গীত আকাদমীর তত্ত্বাবধানে যে উচ্চ বিদ্যায়তন, তার ছাত্র সংখ্যা সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে হাজার জনের বেশী হবে না।

কেবল শিল্প সাহিত্য নাটক অথবা বিজ্ঞান উদ্যোগ ব্যবসা বলে নয়,

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা, ট্রেনিং ও সংগঠনের উপর একাগ্র দৃষ্টি। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে সার্কাস এবং বিভিন্ন খেলাধূলার বিরাট আয়োজন এবং এ সমস্ত সার্কাসের ও অন্যান্য খেলার খেলোয়াড়দের ট্রেনিং-এর জন্যও আলাদা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ না করে এসব শিক্ষায়তনে প্রবেশের অধিকার মেলে না। তার ফলে কয়েকটি বড় লাভ হয়েছে। আঠারো-উনিশ বছরের আগে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা যায় না, কাজেই যারা এ সমস্ত স্কুলে আসে তারা সাবালক এবং অপেক্ষাকৃত স্থিরবুদ্ধি। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে এসেছে বলে পৃথিবী এবং স্বদেশ সম্বন্ধে তাদের ধারণাও অনেকটা পরিণত। স্বেচ্ছায় এ ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করেছে বলে নিজের কাজে তারা তৃপ্ত; অসন্তোষ এবং আত্মঅবিশ্বাসের ফলে কর্মজীবনের যে গ্লানি তা তাদের স্পর্শ করে না। তার একটা বড় লাভ এই যে সবাই শিক্ষিত এবং নিজের কর্মজীবনে পরিতৃপ্ত বলে এ সমস্ত বৃত্তির সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে এককালে নর্তকী বা সার্কাসের ভাঁড় কিংবা খেলোয়াড় বললে জনসাধারণের মনে যে একটা অবজ্ঞার ভাব আসত, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার পরিচয় একেবারেই মেলে না, বরং এ সমস্ত ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতী, তাঁরা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন।

বিভিন্ন আকাদমীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পীদের মনোবৃত্তিতে যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়, এটা আশ্চর্য নয়। বহুক্ষেত্রে মনে হয় যে শিল্পীর সে সম্বন্ধে পুরোপুরি চেতনাও নেই। মস্কোতে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সাহিত্যিক শিল্পী সঙ্গীতকার সর্বদেশে এবং সর্বকালেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক, সমাজের আবহাওয়ায় বড় হয়ে সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকে নিজের শিল্পকলার অনুপ্রেরণা ও মালমশলা সংগ্রহ করেও চিরদিনই বিদ্রোহী, তাই প্লেটোর মতন দার্শনিক তাঁর আদর্শ রাজ্য থেকে শিল্পীকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন, অথচ সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে শিল্পীদের সংগঠিত করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে কি শিল্পসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না? উত্তরে আর্ট আকাদমীর সভাপতি-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য বললেন যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত না করলে তার

প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, এমন কি সমাজদ্রোহী হয়ে সমাজকে ধ্বংস পর্যন্ত করতে পারে। একদিকে ধ্রুপদী সনাতন পন্থার অনুসরণ এবং অন্যদিকে নিত্য নূতন পথের সন্ধান ও আবিষ্কার, এই দুই বিরোধী আদর্শের মধ্যে কোন্ পথে শিল্পীর সার্থকতা, তা নিয়ে এককালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আর শিল্পীর মনে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজ নির্দেশিত পথেই তাঁরা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে ব্যক্তিগত সার্থকতা ও শিল্পী হিসাবে সিদ্ধি লাভ করেন। কেবল মস্কো বলে নয়, অন্যত্রও এই এক ধরনের জবাবই বরাবর পেয়েছি। একজন উজবেগ চিত্রকর বললেন যে সবাই একই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে বলে তাদের অঙ্কনরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গভীর সাদৃশ্য, ফলে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার অবকাশ নেই। জড়বাদী দর্শন আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করবার ফলে তাদের মনে ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়েও বর্তমানে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই।

ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বত্রই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছে। চিত্রকররাও তা অস্বীকার করেন নি, কিন্তু বলেছেন যে যেটুকু স্বাধীনতা তাঁদের প্রয়োজন, বর্তমান ব্যবস্থায় তা তাঁদের মেলে। বোধ হয় এই উক্তির মধ্যেই তাঁদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে—আত্মার স্বাধীনতাকেও তাঁরা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিচার করতে সুরু করেছেন। সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধি কিন্তু এ ধরনের বিচার বা যুক্তি মানে না। তাই রাষ্ট্রের সমস্ত প্রচার সত্ত্বেও ফরাসী চিত্রকরদের বাস্তব-গন্ধ-রহিত কল্পনাবহুল চিত্র তাঁদের চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। মাতিস, গোগ্যাঁ বা পিকাসোর ছবি বহুদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখানো হয়নি, কিন্তু বর্তমানে লেনিনগ্রাদে রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় তাঁদের ছবির আদর দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমি যখন মস্কোতে ছিলাম, নিকোলাস রোয়েরিকের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছিল, তা দেখবার জন্যও লোকের সে কি আগ্রহ! কয়েক বছর আগে যখন ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাঠানো হয়, তখন সেখানকার জনসাধারণ এবং শিল্পীরা শতমুখে তার প্রশংসা করেছেন। ভারতবর্ষের সনাতন চিত্র শৈলীই তাঁদের মুগ্ধ করেছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহু চিত্র সমালোচক ও চিত্রকরের মুখে শুনেছি যে মরুভূমিতে পিপাসায় মরণোন্মুখ

লোক সুস্বাদু জল পেলে তাকে যেমন অমৃত বলে গ্রহণ করে, ভারতীয় চিত্র পদ্ধতি দেখে তাঁদের ঠিক সেইরকম আনন্দ হয়েছে।

শিল্পকলার ব্যাপারে সোভিয়েট ব্যবস্থার সপক্ষেও বলবার কথা রয়েছে। উক্রেনেই বোধ হয় সে কথা সবচেয়ে বেশী সমীচীনভাবে শুনেছি। মনে হল উক্রেনে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেকটা বেশী, এবং সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তির রুচির মধ্যে মোটামুটি একটা আপোষ সেখানে হয়েছে। সেখানকার অন্যতম রাষ্ট্রনেতা বললেন যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় আকাদমীর নির্দেশ মত ছবি কেনা হয়, সাজানো হয়, কিন্তু নিজের গৃহসজ্জার জন্য সোভিয়েট নাগরিক নিজের খুসী মত ছবি কিনতে পারেন, তাতে বাধা নেই এবং ফলে বিভিন্ন ধরনের চিত্রপদ্ধতি বিকাশের সুযোগ সোভিয়েট রাষ্ট্রেও রয়েছে। তিনি বরং দাবী করলেন যে এ ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পীর সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী, কারণ ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট বলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শ্রেণী স্বার্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণ শ্রেণী-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে কেউ যেতে পারে না। তাঁর মতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীবিভাগ লুপ্ত হয়েছে এবং ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অবারিত-ভাবে নিজের রুচি ও প্রতিভার বিকাশ করতে পারে বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের অবকাশ সেখানে অনেক বেশী।

তাঁকে বললাম যে ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, কিন্তু বর্তমানকালে সোভিয়েট রাষ্ট্রেও শ্রেণীবিভাগের পরিচয় মেলে এবং যতদিন বিভিন্ন নাগরিকের আয় ব্যয়ে এত তারতম্য থাকবে, ততদিন এ ধরনের প্রভেদ থাকাও অনিবার্য। ধনতান্ত্রিক দেশেও রুচি শ্রেণীনির্ভর নয়, বহুক্ষেত্রেই ব্যক্তির রুচি সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী নিরপেক্ষ। বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় বা পশ্চিম ইয়োরোপে শ্রেণী সচেতনতা তত তীব্র নয়। তাছাড়া সে সব গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশী বলে শিল্পীদের স্বাধীনতা আরো ব্যাপক ও গভীর। তিনি তবু বললেন যে শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে ধনসম্পদে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত দেশকে অতিক্রম করে যাবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও যেদিন সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের মান অধিকতর উন্নত হবে, সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পীর যে সুযোগ সুবিধা মিলবে, ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্পী বর্তমানে তার কল্পনাও করতে পারে না।

আমি আবার বললাম যে ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে এবং তাঁর স্বপ্ন যেদিন সফল হবে, সেদিন যে সোভিয়েট ব্যবস্থাও বদলাবে না সে কথা কি জোর করে বলা যায়? স্টালিনের মৃত্যুর পর পাঁচ ছয় বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্র যেভাবে বদলিয়েছে এবং এখনো বদলাচ্ছে, তাতে হয়তো বর্তমান কালের দৈন্য ও অভাবের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট নাগরিকের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও অনেকখানি বদলে যাবে। এ কথার তিনি কোন উত্তর দেননি।

চিন্তা ও সৃষ্টির স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পকলার বিকাশ আশানুরূপ হয়নি একথা মানতেই হবে। শিল্পের অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিভার বিকাশ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হয়, ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠতম শিল্পী তাঁদের শিল্প প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিন্তু যাঁরা শিল্পসৃষ্টিতে আজো অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই রুশ বিপ্লবের পূর্বযুগের মানুষ। বিপ্লবের চল্লিশ বৎসরের মধ্যেও যে এতবড় প্রাণবন্ত জাতির মধ্যে কোন বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার আবির্ভাব হয়নি তা বোধ হয় আকস্মিক নয়।

সৃষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে শিল্পবিকাশের নির্গূঢ় যোগ আরেকভাবে বোঝা যায়। সঙ্গীত ও নৃত্য আকাদমীতে বোধ হয় রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার প্রভাব সবচেয়ে কম। সঙ্গীতের প্রকাশে ও নৃত্যের অভিব্যক্তিতে বুদ্ধির চেয়ে আবেগের স্থান বড় এবং আবেগের যে রূপ এই দুটি কলাশিল্পে মূর্ত হয়ে উঠে, তার মধ্যে প্রত্যয় বা ধারণার বিশেষ অবকাশ নেই। অবশ্য সেখানেও টীকাকাররা নানারকম ভাষ্য করে থাকেন। একটি বাজনা শুনিয়ে বলা হল যে ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর সাদাকালো জাতির দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করেই এ সঙ্গীত রচিত হয়েছে, কিন্তু ধনতন্ত্র বা বর্ণসংঘাত বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের সঙ্গীত হিসাবে তাকে গ্রহণ করা যায় তবে কিছু বলবার থাকে না। এমন কি মানুষের সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করে ভুমিকম্প বা ঝড়ের বাজনা বাজাতে চাইলেও একই ধরনের স্বর সঙ্গতির পরিচয় মিলবে।

নৃত্যকলার বেলায়ও প্রত্যক্ষ আবেদনই তার প্রাণ, তার ভাবগত তাৎপর্য কি তা না বুঝেও নৃত্য এবং সঙ্গীত উপভোগ করা যায় বলেই সমস্ত ভাষা

ও অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করে এক দেশের সঙ্গীত ও নৃত্য অন্যদেশের মনকে এত সহজে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই বলে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক বেশী। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎকর্ষ তাই আকস্মিক নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণী সংঘর্ষের উপর এত জোর দেওয়া সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত সোভিয়েট ব্যালে বা নৃত্যনাট্যই যে রাজতন্ত্র বা ধনীদের জীবনবিলাস নিয়ে রচিত এবং সোভিয়েট নাগরিক সানন্দে সাগ্রহে তাকে স্বীকার করে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

সঙ্গীত ও নৃত্যের অপেক্ষাকৃত এ স্বাধীনতা বোঝা যায় কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলাম যে চিত্রকর বা সাহিত্যকের তুলনায় বরং নাট্যকারই সোভিয়েট রাষ্ট্রে অনেক বেশী স্বাধীনতা লাভ করেছেন। বস্তুত নাট্যকার আজকাল যেভাবে প্রকাশ্যে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার গলদ নিয়ে সমালোচনা করছেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সার্কাসে দেখলাম যে রাষ্ট্রশাসকদের ত্রুটি নিয়ে অভিনয়েই জনসাধারণ সবচেয়ে বেশী সাড়া দেয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্কাস-অভিনেতা যখন ডিরেক্টরের ভূমিকায় নেমে বললেন যে ডিরেক্টর হয়েছেন বলে এখন আর তাঁর পরিশ্রম করবার কোন প্রয়োজন নেই, এখন কেবল অন্যের উপর হুকুম বরদারী করেই তাঁর সময় কাটে, আর বিনা পরিশ্রমে ভাল খেয়েদেয়ে শরীরও বেশ মুটিয়েছে, তখন উপস্থিত জনতা কলহাস্যে তাঁর সমর্থন করে। সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকে তাই স্বাধীনতার প্রসার অনেকখানি বেড়েছে, চিত্রকলায় স্বাধীনতার আভাস মেলে, কিন্তু লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা মনে হল সবচেয়ে কম।

তার হয়তো কারণও রয়েছে। সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সাহিত্যেই চিন্তা ও ধারণার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বস্তুতপক্ষে সাহিত্যের সৃষ্টিতে আবেগ ও বুদ্ধি যেভাবে পরস্পর নির্ভর, বোধ হয় অন্য কোন শিল্প সৃষ্টিতে তার পরিচয় মিলবে না। সঙ্গীতের প্রকাশেও অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে, কিন্তু সে ঐক্যে ধারণা বা প্রত্যয়ের স্থান গৌণ, এমনকি বুদ্ধির স্বাভাবিক গতিও সেখানে আবেগ মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ রূপ নেয়। চিত্রকলা ও নৃত্যের বেলায়ও একথা খাটে, কারণ চিত্রে বর্ণ ও রেখার সঙ্গতির মধ্যেই চিত্রকর নিজেকে উপলব্ধি করেন, প্রত্যয় বা বুদ্ধির ওপর বেশী ঝোঁক দিলে চিত্রের

বহুক্ষেত্রে স্বরূপ-হানি হয়। নৃত্যের বেলায়ও ছন্দ ও গতির সঙ্গে বর্ণসুষমা মিলে আমাদের চিত্ত বিনোদন করে, কোন জীবন দর্শন বা ভাবধারার স্থান সহজে সেখানে মেলে না। প্রত্যয় ও ধারণাকে অতিক্রম করে মানুষের আবেগকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে বলে নৃত্য চিত্রকলা ভাষার সমস্ত ব্যবধানকে অগ্রাহ্য করে দেশকালনির্বিশেষে সকলের প্রিয়।

সাহিত্য—এবং নাট্যকলাও সাহিত্যের অঙ্গ—ভাষা নিয়ে কারবার করে এবং ভাব ভিন্ন ভাষার কোন তাৎপর্য নেই। ধারণা বা প্রত্যয়ের অস্তিত্ব না থাকলে ভাষা আর ভাষা থাকে না, কেবল আওয়াজ বা শব্দসমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে তাই পদে পদে দর্শনচিন্তার ইঙ্গিত মেলে এবং আবেগের রঙে তা যতই রঞ্জিত হোক না কেন, ভাবনাচিন্তাকে অস্বীকার করলে তা আর সাহিত্য থাকে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে মার্ক্সবাদের প্রতি যে উগ্রবিশ্বাস, তার ফলে সাহিত্য স্বষ্টিতে পদে পদে যুক্তিতর্ক ধারণার প্রভাব দেখা দেবে একথা তাই বিচিত্র নয়। বরং আশ্চর্যের কথা এই যে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যমান নাটকে নাট্যকার যুক্তিধারণার বন্ধন সত্ত্বেও এতখানি স্বাধীনতা লাভ করেছেন। বোধহয় নাটকের যে দৃশ্যমান দিক, তার প্রাধান্যের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের চেতনায় বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা।

কার্তিক ১৩৬৬

॥ চার ॥

সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের কদরের কথা আগেই বলেছি। প্রাথমিক স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা স্থরু হয় এবং মাধ্যমিক স্তরে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্যই পাঠ্যক্রমের প্রায় অর্ধেক সময় বিজ্ঞানের জন্য নির্ধারিত। তার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্প্রতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে বিস্ময়কর প্রগতি, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার তার অন্যতম কারণ। শিল্পে, উদ্যোগে এবং জীবনযাত্রার মান বিচারে সোভিয়েট রাষ্ট্র আজও আমেরিকার তুলনায় পশ্চাৎপদ, ইয়োরোপের উন্নত রাষ্ট্রগুলিও এসব ব্যাপারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অগ্রগামী, কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারে সোভিয়েট রাষ্ট্র বোধ হয় আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। মিস্টার ক্রুশ্চভ বারবার ঘোষণা করছেন যে দশ-পনেরো বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে উৎপাদন বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে সমানভাবে পাল্লা দেবে—বিজ্ঞানের এ ব্যাপক প্রসারের ভিত্তিতেই তাঁর সে দাবী হয়তো সফল হতে পারে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে অল্পদিনের জন্য যাঁরা বেড়াতে যান, বিজ্ঞানের এ প্রাধান্য তাঁদেরও দৃষ্টি এড়ায় না। মস্কো শহরে আকাডমী অব সায়ান্স বা বিজ্ঞান আকাডমীর যে ইমারত ও বাগবাগিচা, তা দেখলেই এ কথা সহজে বোঝা যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখেছি, কিন্তু যে ধরনের পরিবেশে যে অট্টালিকায় বিজ্ঞান আকাদমীর কেন্দ্রীয় অফিস অন্য কোথাও তার তুলনা মেলে না। বর্তমানকালের সমাজে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকেরই যে প্রাধান্য, তা বোঝাবার জন্যই যেন এ ব্যবস্থা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বৈজ্ঞানিকদের বিষয়ে বলতে গিয়ে সাধারণ নাগরিকের কথায় যে মনোভাব প্রকাশ পায়, তাতে একদিকে যেমন শ্রদ্ধা অন্যদিকে তেমনি ঈর্ষার সংকেত রয়েছে। বৈজ্ঞানিকের স্থান যে বিশিষ্ট, সমাজে তাঁরা যে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী, এ বিষয়ে সাধারণ নাগরিক ও

বৈজ্ঞানিক উভয়েই সমান সচেতন। বস্তুতপক্ষে বহুক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক যে সব বিষয়ে ভাবতেও দ্বিধা করেন, বৈজ্ঞানিক সেই সব বিষয়ে অসঙ্কোচে মতামত প্রকাশ করেন, এমন কি হাতে কলমে তা করতেও দ্বিধা করেন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরা যে স্বাধীনতা পেয়েছেন, জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনতা দাবী করবার সাহস বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মেলে বলে তাঁরাই হয়তো একদিন সোভিয়েট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তর নিয়ে আসবেন।

বিজ্ঞান বলতে আজকাল বহুদেশে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বোঝায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিন্তু সায়েন্স বা বিজ্ঞানের অর্থ সমস্ত বিষয়েরই বিশদ এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান। সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাডমীর মধ্যে তাই পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন বা গণিতের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতি এবং দর্শন ইতিহাস প্রাচ্যবিদ্যা সব কিছুরই স্থান রয়েছে। মস্কোতে দর্শন পরিষদ বা ইনস্টিটিউট অব ফিলসফিতে দর্শন নিয়ে সদস্যদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। প্রথমেই তাঁরা বললেন যে অন্যান্য দেশে দর্শনকে পরাবিদ্যা বলে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার যোগ অস্বীকার করা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু বিজ্ঞান আকাদমীর অংশ হিসাবেই দর্শন পরিষদ পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মতে মার্কসবাদ বিজ্ঞানসম্মত দর্শন বিচার, তাই মার্কসবাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীতেই তাঁরা দর্শনের সমস্ত সমস্যার বিচার করতে উদ্যোগী। মার্কসবাদী হিসাবে তাঁরা কেবল সমস্যার বিচার ও বিশ্লেষণ করেই তৃপ্ত নন, বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যার সমাধানই তাঁদের লক্ষ্য। পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে যেমন ব্যবহারিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব, তাঁদের মতে মার্কসবাদের প্রয়োগে ঠিক সেইভাবেই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানও তেমনি সহজে হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম যে দর্শন যখন কোন সিদ্ধান্তকেই শাশ্বত বলে মানে না, সমস্ত পূর্ব সিদ্ধান্তকে নতুন করে যাচাই করতে চায়, তখন মার্কসবাদের প্রতি তাঁদের এ অপ্রশ্ন অনুরাগ ও বিশ্বাসকে অদার্শনিক বললে অন্যায় হবে কি? উত্তরে তাঁরা বললেন যে মার্কসের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকেই মানতে হবে একথা তাঁরা বলেন না, তবে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক এবং সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীকেই তাঁরা স্বীকার করেন, কাজেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচার পদ্ধতিকে

অবৈজ্ঞানিক বলা সঙ্গত নয়। আমি আপত্তি করলাম যে তাঁদের কথা মেনে নিলেও সন্দেহ মেটে না। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচারপদ্ধতি যে বৈজ্ঞানিক, একথাও বিচার সাপেক্ষ এবং মার্কসের জীবদ্দশায় যে সব কথা তিনি বলেছিলেন, বর্তমান জগতে তার অনেক কথাই খাটে না। বিজ্ঞানের মূল সূত্রই হল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পূর্বজ্ঞানের সংস্কার এবং তার ফলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং পদ্ধতি দুই-ই বদলায়। তা ছাড়া বিজ্ঞান যে সব পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত অপ্রশ্নভাবে মেনে নেয়, দর্শন তাদেরও যাচাই করে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও দর্শনের বিচারের বিষয়, কাজেই দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসের চিন্তাধারার বেলায়ও তাঁর সিদ্ধান্ত এবং পদ্ধতি দুই-ই নতুন করে বিচার করতে হবে। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্লেষণপদ্ধতি অপ্রশ্নভাবে মেনে নিলে তা সম্ভব নয়, ফলে দর্শন বিচারে বাধা আসবে। এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁদের কাছে পাইনি।

মার্কসবাদকে অপ্রশ্নভাবে গ্রহণ করায় যে সোভিয়েট দার্শনিকদের চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে, তার নিদর্শন সহজেই মেলে। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে অনেক তথ্যকে বিকৃত করে দেখা হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাপ্রণালীর উপরও তার ছায়া পড়েছে। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে কেবলমাত্র ব্যবহারবাদ বা বিহেভিয়রিজম দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ মানুষ বহুক্ষেত্রে অভ্যাসের দাস হলেও কোন কোন স্থলে অভ্যাসকে অতিক্রম করে। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারেই যদি মানব জীবনের সবকিছু ঘটত, তবে কর্তব্যবুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাধান্য এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা, এ সব কথার কোনই অর্থ থাকত না। সমস্ত কাজে এবং কথায়ই হয়তো পূর্ব অভ্যাসের খানিকটা প্রভাব রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কার বা পূর্ব অভ্যাস দিয়ে মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি বা স্বার্থত্যাগের কোন যুক্তিসঙ্গত বিবরণ দেওয়া চলে না। মানবসমাজের প্রগতি কিন্তু বুদ্ধির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বলিদানের ক্ষমতার ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছে। মার্কসের নিজের জীবন ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের এ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মার্কসবাদের জড়বাদী দর্শনে মানব চরিত্রের এই বিশিষ্ট লক্ষণের কোন পরিচয় মেলে না।

মার্কসবাদকে অপ্রশ্নভাবে গ্রহণ করবার ফলে যে মানসিক বন্ধন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে বন্ধন ততটা ক্ষতিকর হয়নি বলে সোভিয়েট রাষ্ট্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত বা ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে এগিয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মানুষের প্রভাবকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়, প্রকৃতিকে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে দেখা হয় বলেই বোধ হয় তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু মানুষের স্বভাব ও সমাজ নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানের কারবার, মানসিক এ বন্ধনের ফলে সে সমস্ত ক্ষেত্রে গত চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তেমন কোন প্রগতির লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু তাই নয়। চিন্তার এ বন্ধনের ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে বর্তমানে সমাজের সমস্ত স্তরেই শিল্পী সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের নামকরা দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক প্রায় সকলেই বয়সে পঞ্চাশের বেশী এবং প্রাক বৈপ্লবিক যুগের মানুষ। এ সম্বন্ধে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের প্রসঙ্গে পরে আরো খানিকটা আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

দর্শন পরিষদে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দর্শন অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গবেষণা নিয়েও আলোচনা হল। পাঁচ ভল্যুমে এক বিরাট পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাস তাঁরা রচনা করছেন, সে কথা বললেন এবং প্রথমে যে দু-খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তা দেখালেন। প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষ এবং চীনের দর্শনের এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইয়োরোপের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। বাকী তিনখণ্ড তখনো লেখা হয়নি। পরিষদের সভাপতি বললেন যে ভারত সরকারের উদ্যোগে History of Philosophy : Eastern and Western এই নামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের যে ইতিহাস দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তার বিষয়-সমাবেশ ও আলোচনা পদ্ধতি সোভিয়েট দর্শন পরিষদের পরিকল্পিত ইতিহাসকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছে। সোভিয়েট দার্শনিকেরা আমাদের গ্রন্থখানির অনেক প্রশংসা করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ করলেন যে রুশ দর্শনের পর্যাপ্ত আলোচনা আমাদের ইতিহাসে হয়নি। উত্তরে আমি বললাম যে একটি পুরো অধ্যায়ে মার্কসের চিন্তাধারার আলোচনা করা হয়েছে, প্লেটো বা কান্টের দর্শনের বেলায়ও

এক অধ্যায়ের বেশী স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, লেনিনের চিন্তাধারার আলোচনাও গ্রন্থে মিলবে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত দার্শনিকই মার্কস এবং লেলিনের অনুগামী। তাই তাঁদের স্বতন্ত্র আলোচনা আমরা করিনি। আরো বললাম যে গত চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দর্শনের বিকাশ সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য প্রবন্ধ যদি পরিষদ আমাদের কাছে পাঠান, তবে দর্শন ইতিহাসের নতুন সংস্করণে আমরা সানন্দে তা প্রকাশ করব।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দর্শন পরিষদ বিজ্ঞান আকাদমীর অন্যতম অঙ্গ। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও নগরে প্রাচ্যবিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিও আকাদমীর অন্তর্ভুক্ত। মস্কো, লেলিনগ্রাড এবং তাসকন্দে এ প্রতিষ্ঠানগুলি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার বিস্তার এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের ফলে সমস্ত দেশের সব রকমের বিদ্যা অর্জনের আগ্রহ বেড়েছে, কিন্তু এই বিরাট উদ্যমের মধ্যেও চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের অবাঞ্ছনীয় বন্ধনের ইঙ্গিত মেলে। এককালে প্রাচ্যবিদ্যায়, বিশেষ করে সংস্কৃত, আরবী এবং ফারসী অধ্যয়নে মস্কো ও লেনিনগ্রাডের বিশ্ববিদ্যালয় অপূর্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ওলডেনবুর্গ চেরবাটস্কির খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। পাণ্ডিত্যের সেই নিষ্কাম নিরলস ও আত্ম-সমর্পিত ঐতিহ্য খানিকটা কমে এসেছে মনে হল, মনে হল যে বর্তমানে সোভিয়েট পণ্ডিতদের দৃষ্টি সাম্প্রতিক সমস্যার প্রতি বেশী আগ্রহশীল। মস্কোতে প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার দিকেই বেশী ঝোঁক দেখলাম। হিন্দী, উর্দু এবং বাঙলা শেখবার ব্যবস্থা মস্কো এবং অন্যান্য কয়েক জায়গায় রয়েছে। মারাঠী এবং পাঞ্জাবী শেখবার ব্যবস্থাও সত্বর হবে শুনলাম, সে তুলনায় সংস্কৃত আরবী ফারসীর সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান নেই।

প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎভাবে ভাষা শেখানোর চেয়ে ভাষাতত্ত্ব এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার পদ্ধতির প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের স্কুলে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা নিয়েও নানা রকমের পরীক্ষা চলছে। সাধারণত শব্দতত্ত্ব শেখাবার পরে বর্ণমালা শেখানো হয়, তারপরে ব্যাকরণ এবং পাঠমালা। রাজনৈতিক গুরুত্বশালী কয়েটি ভাষা শিক্ষার বিশেষ

ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি। তাদের বেলায় কেবল ভাষাই শেখানো হয় না, সেইসব ভাষার মাধ্যমে সমস্ত অধীত বিষয় পড়ানো হয় বলে সে সব স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। সোভিয়েট পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখেছেন, তার মধ্যে হিন্দী, উর্দু, বাঙলা, তামিল, মারাঠী এবং পাঞ্জাবী ব্যাকরণ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে যে কাজ হয়েছে সে সম্বন্ধে সোভিয়েট ভাষাবিদরা সচেতন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলা ব্যাকরণ এবং ডঃ আর্যেন্দ্র শর্মার হিন্দী ব্যাকরণের খুব সুখ্যাতি শুনলাম। রুশ পণ্ডিতদের মতে তাঁরাই প্রথম আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যাকরণ লিখেছেন।

মার্কসবাদীর মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের মর্যাদা বেশী। মস্কোতে যে ভারতবর্ষের ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের চেয়ে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বেশী অনুরাগ, মার্কসবাদের প্রভাব তার অন্যতম কারণ। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েট নাগরিকদের জীবনে রাজনৈতিক শক্তি যে ভাবে সক্রিয়, বোধ হয় অন্য দেশে তার নজীর এত স্পষ্টভাবে মিলবে না। মস্কোর তুলনায় লেনিনগ্রাডে বরং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রভাব স্পষ্টতর। মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে তাই বর্তমানে সংস্কৃত বা আরবী ফারসী ভাষা বা সাহিত্যের দিকে পূর্বের মত একাগ্র দৃষ্টি নেই। অবশ্য ভবিষ্যতে এ সমস্ত বিষয়ে কাজ করবার পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে এ কথাও শুনলাম, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং ভারতবর্ষের গত তিনশো বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়েই সেখানে বেশী কাজ হচ্ছে। বিষয় নির্বাচন থেকেই তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

লেনিনগ্রাড রাজধানী নয় বলে বোধ হয় রাজনীতির দাবী সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঝোঁকও সেখানে তাই বেশী মনে হল। বর্তমানে লেনিনগ্রাডের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান মহাভারতের এক নতুন প্রমাণ্য অনুবাদ প্রকাশ করছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এক প্রামাণ্য অনুবাদও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কমেছে মনে হল। ১৯৫৬ সালে যখন মস্কো গিয়েছিলাম, তখন শুনেছিলাম যে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ বহুদিন অপূর্ণ রয়েছে। এবার যখন সে বিষয়ে

জিজ্ঞাসা করলাম, তখন শুনলাম যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং তাসকন্দে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপকের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু ওলডেনবুর্গ বা চেরবাটস্কির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের অধ্যাপক ছিলেন, সে রকম চেয়ার-অধিকারী অধ্যাপক বর্তমানে কেউ আছেন কিনা, এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

সংস্কৃতের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে বরং আরবী ফারসীভাষা ও সাহিত্যের জন্য অনুরাগ বেশী মনে হল। আরবী এবং ফারসী এখনো অনেক দেশের রাষ্ট্রভাষা, কাজেই তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সংস্কৃতের তুলনায় বেশী। বর্তমান যুগে সংস্কৃত একান্তভাবে সংস্কৃতির ভাষা। ভারতবর্ষেও তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলেই বোধ হয় সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে সংস্কৃতের তুলনায় হিন্দীর প্রতি আগ্রহ বেশী। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ফারসীর কদর সহজেই বোঝা যায়। বহু শতাব্দীর ইতিহাসের প্রভাবে এশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্রগুলিতে এখনো ফারসী বহুক্ষেত্রে রাজনীতি এবং সংস্কৃতির ভাষা। যেখানে ফারসী রাষ্ট্রভাষা নয়, সেখানেও স্থানীয় ভাষার ফারসীর সঙ্গে মিল রয়েছে বলে সেখানকার বাসিন্দারা সহজেই ফারসী শিখে নেন। মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডঃ গফুরভ খানিকটা গর্বের সঙ্গেই বললেন যে ইরাণে ফারসীভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার যে ব্যবস্থা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা তার তুলনায় কোন মতেই হীন নয়। তিনি একথাও বললেন যে শুধু আজ বলে নয়, বহুকাল ধরে মধ্য এশিয়ায় ফারসীভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলে এসেছে, ফারসী-ভাষার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই মধ্য-এশিয়াবাসী। সে প্রসঙ্গে ইবনে সিনা উলুগবেগ বা আর রাজীর নাম সহজেই মনে আসে। লেনিনগ্রাডে ফারসী পুঁথি ও গ্রন্থের সংগ্রহ খুবই সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে তার যে নতুন ক্যাটালগ তৈরী হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী ও গবেষকের খুবই কাজে লাগবে। লেনিনগ্রাডের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ফিরদৌসীর শাহনামার নতুন এক প্রামাণ্য অনুবাদ তৈরী করছে।

তাসকন্দের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে ফারসী এবং তুর্কীভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে কাজ হচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ডিরেক্টর একজন মহিলা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রে যত বিদ্বজ্জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে

তাঁর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র বিদ্যাবত্তায় নয়, স্বাধীনভাবে বিচার করবার শক্তিতেও তাঁকে খুবই উঁচু জায়গা দিতে হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে এবং বাইরের অন্যান্য দেশে আরবী ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে যে কাজ হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ দেখলাম। আলবেরুণীর যে প্রামাণ্য সংস্করণ সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের দায়রাতুল মারিফ প্রকাশিত করেছে, তার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন। একথাও অসঙ্কোচে স্বীকার করলেন যে বাবরনামা এবং গুলবদন বানুর আত্মকথার শ্রেষ্ঠতম সংস্করণ ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হয়েছে। তাসকন্দে ইবনেসিনার রচনার প্রামাণ্য সংস্করণ ও প্রামাণ্য অনুবাদ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। আর রাজীর একটি অপ্রচলিত রচনার উল্লেখ বহু জায়গায় মেলে কিন্তু ১৯৫৩ সালে তাসকন্দের পুস্তক সংগ্রহের ক্যাটালগ তৈরীর সময়েই তার পাণ্ডুলিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৭ সালে যখন "রহস্যগ্রন্থ" নামে সে বইখানি প্রকাশিত হয়, তখন সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বাবরের আত্মজীবনী তুর্কী সাহিত্যের অনুপম সম্পদ। খাস তুর্কী থেকে রুশ ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে এবং বর্তমানে তাসকন্দের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান বাবরের চিঠিপত্রের খোঁজ করছেন। আলী শের নওয়াই বলে মধ্য এশিয়ায় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে বাবরের অনেকদিন ধরে পত্রালাপ হয়েছিল। আলী শের নওয়াই বাবরকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন, তার মুসাবিদা পাওয়া গেছে, কিন্তু বাবর তাঁকে কি লিখেছিলেন, তার খোঁজ আজো মেলেনি। বাবরের চিঠিপত্র এবং রচনার ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে আরো খোঁজ হওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদমীর অন্যতম অঙ্গ গর্কী বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ। নাম শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম যে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য অনুবাদই বুঝি পরিষদের প্রধান কাজ। কিন্তু আলাপ করে দেখলাম যে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে পরিষদের তরফ থেকে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে ইতিহাস দু-খণ্ডে রচিত হবে, প্রথম খণ্ডে আদি যুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যের বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উনিশ ও

বিশ শতকের বিশদ আলোচনা থাকবে। বই লিখতে গিয়ে কিন্তু এ পরিকল্পনা বদলে গেল। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে শেক্সপিয়র পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শেক্সপিয়র থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের গোড়ায় রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনা মেলে। বাকী তিনখণ্ডে গত দেড়শো বছরের সাহিত্যের বিচার করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ইংরাজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ প্রথম দু-খণ্ডে শেষ করে কেবল বিগত দেড়শো বছরের জন্য গ্রন্থের তিন খণ্ডের ব্যবহার কি যুক্তিসঙ্গত? গ্রন্থের সম্পাদক বললেন যে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা উনিশ শতক পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের বিশদ বিবরণ লিখেছেন, তাই নতুন করে তার বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। গত একশো দেড়শো বছরের ইতিহাসের সে তুলনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়নি, কাজেই সোভিয়েট পণ্ডিতেরা সেই দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। এ যুক্তি আমি পুরোপুরি মানতে পারিনি। আমার মনে হল যে ইংরাজি সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব বেশী করে দেখাবার জন্যই ইতিহাসের বিষয় এ ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। দেড়শো বছর আগে মার্কসবাদের জন্মই হয়নি এবং গত একশো বছরেই তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব ইংরাজি বা অন্য কোন সাহিত্যে মিলবে বলেই এই দেড়শো বছরের ইতিহাস এত বিশদভাবে লেখা হবে।

আমি বিশ্ব সাহিত্য পরিষদের অধ্যক্ষকে বললাম যে তাঁরা যে ইংরাজি এবং অন্যান্য সাহিত্যের এ ধরনের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় একজন জার্মান, একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী পণ্ডিত যে সাধনা করেছেন, ভারতবর্ষ তা কোনদিন ভুলবে না। সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের এ ধরনের ইতিহাস রচনার কোন পরিকল্পনা বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় অধ্যক্ষ বললেন যে একাজ বিশ্ব সাহিত্য পরিষদের নয়, প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজের জন্য দায়ী।

বস্তুতপক্ষে জীবনের প্রকাশকেই সঙ্ঘবদ্ধ করবার যে চেষ্টার পরিচয় সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে মেলে, বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী প্রভাব তার অন্যতম কারণ। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার কি ফল সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু দর্শন, প্রাচ্যবিদ্যা এবং ভাষা ও

সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাতে লাভ এবং লোকসান দুই-ই হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যে সমস্ত মূলসূত্রকে অপ্রশ্নভাবে স্বীকার করে নেয়, দর্শন সেগুলিকেও বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চায়। কাজেই দর্শনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবাধ প্রয়োগ করলে দর্শন বিচার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভাষাতত্ত্বের বেলায় বৈজ্ঞানিক বিচারে লাভ ছাড়া লোকশান নেই, কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বত্র সফল হয় না। সোভিয়েট রাষ্ট্র কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানকে ধর্মবিশ্বাসের মতন আঁকড়ে ধরেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষে পশ্চিম ইয়োরোপ যেভাবে বিজ্ঞানের পূজা করেছে, আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার পুনরাবৃত্তি চলছে বললে অন্যায় হবে না।

বিজ্ঞানের যেখানে এত কদর, সেখানে যে বৈজ্ঞানিকের সামাজিক মর্যাদা অসাধারণ হয়ে দেখা দেবে তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে বিজ্ঞান আকাদমীর সদস্য হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় আর কিছুই নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা যাঁদের হাতে, কম্যুনিষ্ট পার্টির সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের কথা আলাদা। তাঁদের বাদ দিলে বাকী সোভিয়েট নাগরিকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের স্থান সর্বোচ্চ বললে অত্যুক্তি হবে না। বিজ্ঞান আকাদমীর যাঁরা পূর্ণ সদস্য, তাঁরা যে কেবল সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তা নয়, আর্থিক স্বচ্ছলতার এবং জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রয়োজনের দিক থেকেও তাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রে অগ্রণী।

বিজ্ঞান আকাদমীর সদস্যপদ লাভের জন্য সোভিয়েট মনীষীদের আগ্রহ তাই সহজেই বোঝা যায়। আমি যে সময় মস্কো গিয়েছিলাম, তখন আকাদমীর পূর্ণ সদস্যের সংখ্যা ছিল ১৫২। পূর্ণ সদস্য ছাড়াও করেসপণ্ডিং মেম্বার রয়েছেন। তাঁরা সদস্যদের কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পান, কিন্তু আকাদমীর পরিচালনায় তাঁদের কোন হাত নেই। সমস্ত সোভিয়েটরাষ্ট্রের জন্য সোভিয়েট আকাদমী, তাছাড়াও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় আকাদমী রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যাঁরা রাষ্ট্রীয় আকাদমীর পূর্ণ সদস্য, তাঁরা সোভিয়েট আকাদমীর করেসপণ্ডিং মেম্বর। সাধারণত এই সমস্ত করেসপণ্ডিং মেম্বারদের মধ্য থেকেই পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু একেবারে সরাসরি পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তারও নজীর রয়েছে। পূর্ণ সদস্যের কোন বাঁধাধরা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। তা

বাড়তে কমতে পারে। পূর্বে প্রতি তিন বছরে একবার সদস্য নির্বাচন করা হত। বর্তমানে আকাদমীর সভাপতিমণ্ডলী প্রতি বৎসর স্থির করেন যে কতজন সদস্য নির্বাচন করা হবে। পূর্বে বৎসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের কার্যক্রম কতখানি সফল হয়েছে এবং পরের বছর বিজ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন—এই দুটি কথা বিচার করে কতজন সদস্য নির্বাচন করা হবে তা স্থির করা হয়। নির্বাচন প্রণালী ভাল করে বোঝাবার জন্য আকাদমীর জনৈক কর্মকর্তা বললেন যে বর্তমানে পলিমার কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন তাই সাতজন পলিমার কেমিস্টকে আকাদমীর সদস্য নির্বাচন করবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আমি বললাম যে নির্বাচনের যে পদ্ধতি, তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সদস্যদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন মনে হয়। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য যিনি নির্বাচিত হবেন, এবং যাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য নির্বাচন করা হবে, এ দু-জনের মধ্যে তুলনা হবে কি ভাবে? শুধু তাই নয়, উৎসাহ দেবার ভিত্তিতে কাউকে নির্বাচন করলে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা এড়ানো কঠিন, সভাপতিমণ্ডলীর পছন্দ অপছন্দের উপর অনেকখানি ফলাফল নির্ভর করবে। আকাদমীর কর্তৃপক্ষেরা এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারেননি, কিন্তু একথাও তাঁরা স্বীকার করতে চাননি যে সদস্য নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের কোন সম্ভাবনা আছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের যে প্রসার, এবং শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা পৃথিবীতে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের কাজের যে ভাবে যাচাই হয়, তাতে কার্যত হয়তো তাঁদের কথাই ঠিক, কিন্তু তবু প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে পক্ষপাতের সম্ভাবনা খানিকটা থেকে যায়, একথাও অস্বীকার করা চলে না।

আকাদমীর সমস্ত শাসনভার সভাপতিমণ্ডলের উপরে ন্যস্ত, কাজেই সভাপতিমণ্ডলের সংগঠন সম্বন্ধে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। সভাপতিমণ্ডলেরও একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক ও তিনজন সহ-সভাপতি রয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পাঁচজন সম্পাদক, সমস্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সাতজন সদস্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আকাদমীর চারজন প্রতি-নিধি ও আরো চারজন আকাদমীসিয়ান এই পঁচিশজন সদস্য নিয়ে সভাপতি-মণ্ডল গঠিত। সভাপতিমণ্ডলের সদস্যেরা সাধারণত তিন বছরের জন্য

নির্বাচিত হন, কিন্তু সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের নির্বাচন পাঁচ বছরের জন্য। পূর্বেই বলেছি যে করেসপণ্ডিং মেম্বরদের আকাদমীর পরিচালনায় কোন হাত নেই কাজেই কেবলমাত্র পূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকেই সভাপতি-মণ্ডলের সদস্য নির্বাচন করা হয়।

সভাপতিমণ্ডলের যিনি সভাপতি, তিনিই প্রধান কর্মকর্তা। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তিনি কাজ করেন, কার্যত বলা চলে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাছেই তাঁর কাজের জবাবদিহি হয়। আকাদমীর বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠলে মন্ত্রী-সভার বৈঠকে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি উপস্থিত হয়ে আকাদমীর কথা মন্ত্রীসভার সামনে পেশ করেন, কিন্তু আলোচনায় যোগ দেবার স্থযোগ থাকলেও মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে তাঁর কোন অধিকার নেই! যদি মন্ত্রীসভায় কখনো ভোটের কোন প্রশ্ন ওঠে, তবে আকাদমীর সভাপতি সেখানে কেবলমাত্র দর্শক। তা ছাড়া মন্ত্রীসভার অদল বদল হলেও বিজ্ঞান আকাদমীর সভাপতিমণ্ডলের বা মণ্ডলের সভাপতির কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই বলা চলে যে ভারত সরকারের ব্যবস্থায় কেবিনেট সেক্রেটারীর যে পদমর্যাদা ও স্থান, সোভিয়েট রাষ্ট্র আকাদমীর সভাপতির পদমর্যাদা ও স্থান তার সঙ্গে তুলনীয়।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট আকাদমী ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র আকাদমী রয়েছে। এ সমস্ত আকাদমীর বেলায়ও পূর্ণ সদস্যেরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু করেসপণ্ডিং মেম্বাররাও কতকগুলি স্থযোগ স্থবিধা পান। বিশেষ করে পূর্ণ সদস্য হবার জন্যও করেসপণ্ডিং মেম্বর হওয়া বহুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। কিয়েভে যখন গিয়েছিলাম, তখন সেখানে এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভা হচ্ছিল বলে উক্রেনিয়ার আকাদমী দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু তাসকন্দে উজবেকীস্তানের আকাদমীতে সেখানকার সদস্যদের সঙ্গে অনেক আলাপ হল। ১৯৪৩ সালে উজবেকিস্তানের আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বোধহয় মহাযুদ্ধের সময় বিজ্ঞানের প্রসারের প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল বলেই স্বতন্ত্রভাবে তার প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে আকাদমীর ২৮ জন পূর্ণ সদস্য এবং ৩৫ জন করেসপণ্ডিং মেম্বর। সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি এই দু-জন সোভিয়েট আকাদমীর করেসপণ্ডিং মেম্বর এবং শুনেছিলাম যে সভাপতি সত্বরই সোভিয়েট আকাদমীর পূর্ণ

সদস্য নির্বাচিত হবেন। এ বছর জানুয়ারী মাসে ভারতীয় সায়ান্স কংগ্রেসের সময় শুনলাম যে তিনি এখন সোভিয়েট আকাদমীর পূর্ণ সদস্য—উজবেকীস্তানের আর কোন বৈজ্ঞানিক পূর্বে এ সম্মান লাভ করেন নি।

সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদমীর ১৫২ সদস্যের মধ্যে ত্রিশ জন ছাড়া বাকী সবাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, সমস্ত সদস্যর তাঁরা এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী। যে ত্রিশজন আকাদমিশিয়ান সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মানবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত, তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিকরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। সোভিয়েট আকাদমীতে এ সমস্ত মানববিদ্যা বিশারদ তবু প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, উজবেকীস্তানের আকাদমীতে তাঁদের সংখ্যা আঠাশ জনের মধ্যে মাত্র দু-জন।

মস্কো এবং তাসকন্দ দুই শহরেই আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। মানববিদ্যায় যাঁরা অনুরাগী তাঁদের সংখ্যা এমনিতেই কম, কাজেই তাঁদের পক্ষে ভবিষ্যতে আকাদমীর সদস্য নির্বাচিত হওয়া দিন দিন আরো কঠিন হয়ে উঠবে। আকাদমীর কর্তৃপক্ষেরা একথা মানতে চাননি, বলেছেন যে সদস্য নির্বাচনের যে পদ্ধতি, তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানববিদ্যার সমান সুযোগ মিলবে। আকাদমীর সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান পরিষদ, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা দর্শন সংস্থা সদস্য নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব করতে পারে। সোভিয়েট আকাদমীর বেলায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আকাদমীরও নাম প্রস্তাবের অধিকার আছে। নির্বাচনের প্রায় দু-মাস আগে সমস্ত প্রস্তাবিত নামের নামের লিস্ট গেজেট এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে প্রকাশ্যভাবে এবং গোপনে অনেক আলোচনা হয়। সভাপতিমণ্ডলীর সামনে সে সমস্ত আলোচনা বিতর্ক পেশ করা হয় এবং গোপন বৈঠকে সভাপতিমণ্ডলী তাঁদের মধ্য থেকে নির্ধারিত সংখ্যার নাম সাধারণ সভায় পেশ করেন। সাধারণ সভা সে সমস্ত প্রস্তাব ইচ্ছা করলে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সভাপতিমণ্ডলের প্রস্তাবিত নাম বোধ হয় কখনো বাতিল হয়নি।

বর্তমানে সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদমীর তরুণতম সদস্য সারাজভ। তিনি পদার্থবিদ এবং ৩১ বৎসর বয়সেই তিনি আকাদমীর পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত

হন। এখনো তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর হয়নি। প্রাচীনতম সদস্য যিনি তাঁর বয়স কিন্তু নব্বুই পেরিয়ে গিয়েছে। কাজেই আকাদমীতে প্রবীণ ও তরুণের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। আকাদমীর প্রভাব কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিক মূল্যায়ন এমন কি রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপরেও তার প্রভাব সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে দিন দিন বাড়ছে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ রচনার কল্পনাও তার অন্যতম ফল বললে অন্যায় হবে না।

মাঘ ১৩৬৬

॥ পাঁচ ॥

আগামী বৎসর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সোভিয়েট দেশে যে সমারোহে উদযাপিত হবে, তা সত্যই বিস্ময়কর। বর্তমানেও রবীন্দ্রনাথের রচনার সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিপুল সমাদর। তাঁর যে কোন গ্রন্থের অনুবাদই প্রকাশের অতি অল্পদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। শতবার্ষিকী উপলক্ষে চোদ্দ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীর এক নতুন সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনের মূল্যায়ন করে নতুন প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। ভারতীয় সাহিত্য আকাদমী আট খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের রচনার যে সংকলন প্রকাশ করছে, তার কবিতা খণ্ডের জন্য আমি যে ভূমিকা লিখেছিলাম, রুশ ভাষায় তার অনুবাদের জন্য মস্কোতে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নিজে আমাকে অনুরোধ করলেন। সে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং রুশ ভাষায় যে প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তাতেও সন্নিবিষ্ট হবে।

কবি, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী এবং নাট্যকার হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে পরিচিত। শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে ভারতীয় জীবনে তাঁর যে অপূর্ব দান, এসব ক্ষেত্রেই তাঁর ভাবনা বর্তমান পৃথিবীর জন্য যে কি উপযোগী, সে বিষয়ে বাঙলা দেশের বহুলোকই খবর রাখে না, কাজেই ভারবর্ষের অন্যত্র অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নব-ভারতের অন্যতম স্রষ্টা এবং বর্তমানযুগের পথিকৃত হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি এখনো ব্যাপক হয়নি। তার কারণও আছে। সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি বা ধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার অধিকাংশ আজো ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি, অথবা যেগুলির অনুবাদ হয়েছে, সে অনুবাদ আংশিক এবং বহুক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। তাই শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত রচনার একটি সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞ প্রায় একশজন বাঙালী মনীষীকে সাহিত্য আলোচনার বাইরে রবীন্দ্রনাথের অন্য গদ্য রচনার মধ্যে তাঁদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিশটি প্রবন্ধ নির্বাচন করতে অনুরোধ করা হয়। প্রায় চল্লিশজন সাহিত্যরসিক এ

আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং তাঁদের নির্বাচনের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ত্রিশটি প্রবন্ধ নতুন করে অনুবাদ করা হয়। সে অনুবাদগুলি দেশে এবং বিদেশে বহু মনীষীর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয় যে তাঁদের দেশে মানুষের কাছে বিশ্ব মানবের আবেদন পৌঁছিয়ে দেবে, এমন পনেরো কুড়িটি প্রবন্ধ যেন তাঁরা তার মধ্য থেকে বেছে দেন ; ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনেক মনীষীর সহযোগিতায় অবশেষে আঠারোটি প্রবন্ধ নির্বাচন করে Towards Universal Man বা বিশ্বমানবের সন্ধান নাম দিয়ে গ্রন্থখানি ভারতবর্ষে, লণ্ডনে এবং নিউইয়র্কে ১৯৬১ সালের ৭ই মে প্রকাশিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের মতন সোভিয়েট রাষ্ট্রেও গ্রন্থখানির অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি"-কে নাটকে রূপান্তরিত করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশে তার অভিনয় এখনো হচ্ছে। তাসকন্দে তার বিপুল সমাদর হয়েছে। মস্কোতেও দেখলাম জনসাধারণের হৃদয়কে নৌকাডুবির নাট্যরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের নতুন অভিনয়ের আয়োজন করছে। পরিষদের অধ্যক্ষ বললেন যে নাটকের চেয়ে নৃত্যনাট্যই সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে বেশী প্রিয়, কিন্তু নৃত্যনাট্যের নির্বাচন নিয়ে তাঁদের মধ্যে খানিকটা মতভেদ ছিল। কারো কারো ইচ্ছা ছিল যে "চণ্ডালিকা"-র অভিনয় হোক কিন্তু আমি তাঁদের বললাম যে "চণ্ডালিকা" একান্তভাবে ভারতবর্ষের জন্য রচিত। ভারতবর্ষের পরিবেশ বাদ দিলে তার স্বাদ অন্য দেশে পুরোপুরি গ্রহণ করা কঠিন, তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার তেমন সার্থকতা নেই। তাছাড়া ভারতবর্ষের সামাজিক গলদ ভারতবর্ষে দেখানোর যতখানি প্রয়োজন অন্যদেশে সে প্রয়োজন নেই। "তাসের দেশ" হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী উপযোগী, কিন্তু ঠিক যে কারণে "তাসের দেশ" সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখাতে বাধা আসতে পারে, ঠিক সেই কারণেই "চণ্ডালিকা" সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্যও উপযোগী নয়।

আমি বললাম যে আমার মতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে "চিত্রাঙ্গদা" সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আবেদন কোনো দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়। নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যার "চিত্রাঙ্গদা"য় রূপায়ন, সর্বদেশে সর্বকালে তা মানব-

জীবনের চিরন্তন সমস্যা হয়ে বেঁচে থাকবে। তবে যদি তাঁরা মত বদলান, নৃত্যনাট্যের বদলে নাটক অভিনয় করতে রাজী হন, তবে "বিসর্জন", "মুক্তধারা", "রক্তকরবী" বা "রাজা"-র অভিনয় শতবার্ষিকী উৎসবে খুবই উপযোগী হবে। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম পথিকৃত শ্রীশম্ভু মিত্র কিছুদিন আগে মস্কো গিয়েছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের সদস্যদের মধ্যেও দু-একজন বোধ হয় তাঁর অভিনয় দেখেছেন। তাঁদের বললাম যে "রক্তকরবী"-র প্রযোজনা করে শম্ভু মিত্র ভারতীয় নাট্য উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। অনেক আলোচনার পরে স্থির হল যে সবদিক বিবেচনা করে "চিত্রাঙ্গদা"-র অভিনয়ই যুক্তিযুক্ত হবে। অধ্যক্ষ বললেন যে প্রযোজনার বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে তাঁরা একজন শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করতে চান। সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমারোহের সঙ্গে "চিত্রাঙ্গদা"-র অভিনয় হবে, একথা এখন নিশ্চয় করে বলা চলে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গীত পরিষদও শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের নতুন সঙ্গীত-রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। সোভিয়েট সিনেমাতেও রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে এবং তাঁর রচনাকে কেন্দ্র করে নতুন চিত্র রচনার পরিকল্পনা হয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের সফর এবং বিশেষ করে তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" নানাভাবে প্রচারিত করবারও ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে। তা ছাড়া, ১৯৬১ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে এবং গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের নাটক, গদ্য-পদ্য রচনা, সঙ্গীত এবং তাঁর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিরাট আয়োজন হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এ আগ্রহ স্বভাবতই আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যিকার কৌতূহল ও আগ্রহ সর্বত্রই দেখলাম। মস্কোর লুনাচারস্কি ইনস্টিটিউটের কথা আগেই বলেছি। নাট্যশিল্প নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ প্রতিষ্ঠানটির স্থান খুবই উঁচু। সেখানকার অধ্যক্ষ বললেন যে তাঁরা কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয় করতে চান। আধুনিককালে ভারতবর্ষে শকুন্তলার অভিনয় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বললাম যে গত

দু-তিন বছর ধরে উজ্জয়িনীতে সমারোহের সঙ্গে কালিদাসের বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে এবং সে অভিনয় সংস্কৃতে হলেও জনসাধারণ তা সাদরে গ্রহণ করে। সেই প্রসঙ্গে বললাম যে ১৯৫৮ সালে উৎসবের সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে শকুন্তলার অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ পরিগণিত হয়েছিল। শকুন্তলা পরিবেশন করে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। অধ্যক্ষ বললেন যে কালিদাসের নাটকের দৈর্ঘ্য নিয়ে তাঁরা ভাবনায় পড়েছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের দর্শকবৃন্দ দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশী নাটক দেখতে হয়তো চাইবে না। তাঁকে বললাম যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। উজ্জয়িনীতে শকুন্তলার যে অভিনয় হয়েছিল, তা-ও বোধ হয় আড়াই ঘণ্টার বেশী সময় নেয়নি।

কেবল লুনাচারস্কি ইনস্টিটিউট বলে নয়, রবীন্দ্রনাথের মতন কালিদাসের বিষয়েও আগ্রহ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যাপক। সোভিয়েট সঙ্গীত পরিষদ শকুন্তলাকে সঙ্গীতরূপ দেবার চেষ্টা করছে এবং পরিষদের সভাপতি বললেন যে কালিদাসের রচনা পাঠ করে তাঁরা যে আনন্দ পান, বর্তমান যুগের লেখকদের মধ্যে প্রায় কারু রচনাই ততখানি আনন্দ দেয় না। নৃত্যনাট্যে পুরাতনের প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুরাগের কথা আগেও বলেছি, দেখলাম যে এ পুরাতন প্রীতি কেবলমাত্র রুশ নৃত্যনাট্যে সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্গীত পরিষদের সভাপতি বললেন যে তাঁরা সম্প্রতি লায়লা মজনুর কাহিনী নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, এবং সে নৃত্যনাট্য যে সমাদর পেয়েছে তাতে শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ আরো বেড়ে গিয়েছে। লায়লা মজনুর সঙ্গীত শোনালেন, তার মধ্যে প্রাচ্য সঙ্গীত ভঙ্গীর আমেজ রয়েছে, কিন্তু মূলতঃ নৃত্যনাট্যটি ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার তাঁরা নতুন করে ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতে সুর দিয়েছেন। বললেন যে এখন নতুন নতুন ভারতীয় রচনা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করতে চান। মস্কো থেকে ফেরবার পরে আমাকে জানিয়েছেন যে আমার "সাথী" বইটির একটি কবিতা 'রাখাল'কে তাঁরা সঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন।

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগের আরো দু-একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। মস্কোতে "মুদ্রারাক্ষস"-এর যে অভিনয় হয়েছিল, তা আমি নিজে দেখিনি,

কিন্তু ভারতীয় যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা একজন ভারতীয় মনীষী আমাকে বললেন যে "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখে সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেছে। "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখবার আগে পর্যন্ত তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন, বলতেন যে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতাকে পদে পদে ব্যাহত করা হয়েছে, মানুষের জীবনের মূল্য বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে, তিনি তাকে কখনোই স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু "মুদ্রারাক্ষস"-এ বিদেশী সংস্কৃতি এবং জীবনাদর্শকে যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে তা দেখে তাঁর মনে হল যে পূর্বে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে মানুষের মর্যাদা নতুন করে স্বীকার করবার চেষ্টা স্পষ্ট।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আগের বা পরের কোনো মতই আমি পুরোপুরি মানতে পারিনি। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে ব্যক্তি চিরদিনই নিয়মকে লঙ্ঘন করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, চিরদিনই দৈত্যকুলেই প্রহ্লাদের জন্ম হয়। তাই স্টালিনের আমলেও সোভিয়েট নরনারী রাষ্ট্রের লৌহশাসনের মধ্যেও স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যের চরম বিকাশ দেখিয়েছে। আজ মিঃ ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে পুরনো কড়াকড়ি বহুল পরিমাণে কমে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসনের বন্ধন পুরোপুরি শিথিল হয়নি। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ সাম্যবাদী হোক অথবা গণতান্ত্রিক হোক, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাই চির-দিনই শাসনের বন্ধন কমবেশী থাকবে। আসলে পৃথিবীতে আজো সত্যকার গণতন্ত্র কোন্ দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বারবার গণতন্ত্র স্থাপনের সাধনা হয়েছে কিন্তু ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ সে প্রচেষ্টাকে বারবার ব্যাহত করেছে। একথাও সত্য যে বর্তমান যুগের পূর্বে গণতন্ত্র স্থাপনের আর্থিক কাঠামো পৃথিবীতে কোনদিন দেখা যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে মানুষ অভাবের ভিত্তিতেই সমাজ সংগঠন করেছে। একক ব্যক্তি জীবন সংগ্রামে টিকতে পারে না, তাই গোষ্ঠী গড়ে উঠল। পশু সমাজেও গোষ্ঠীর পরিচয় মেলে, কিন্তু সাধারণত বহু স্ত্রী এবং একটি নরের সমাবেশেই পশুগোষ্ঠী। যৌন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর অথবা অন্ততপক্ষে কম করতে না পারলে বহুসংখ্যক সাবালগ পূর্ণযৌবন স্ত্রীপুরুষের সমাজ গড়ে

উঠতে পারে না এবং মানুষ সে সমস্যার চলনসই সমাধান করতে পেরেছিল বলেই মানুষের প্রগতি এক ব্যাপক ও দ্রুত। অন্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই যৌন সম্পর্ক অবাধ এবং বহুক্ষেত্রে সাময়িক, কিন্তু সেই সম্বন্ধকে সমাজ বন্ধনের মধ্যে স্থায়ী রূপ দিয়ে এবং স্বগোষ্ঠী বা স্বগোত্রের নারীকে বিবাহ-অযোগ্যা করেই মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়কে পেরেছিল। আদিবাসী জাতির মধ্যে আজো তার পরিচয় স্পষ্ট, প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ হিন্দু সমাজেও গোষ্ঠী ও গোত্র বন্ধনের মধ্যে তারই ইঙ্গিত মেলে।

সমাজ গড়বার পরেও কিন্তু বহুদিন মানুষের খাদ্যবস্ত্রের অভাব দূর হল না, বরং নতুন নতুন দাবীর সৃষ্টি হল। একদিকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অফুরন্ত, অন্যপক্ষে তার উদ্যম সীমিত, সম্পদ অত্যন্ত পরিমিত। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও বহুকে বঞ্চিত করে স্বল্পসংখ্যক লোক ঐশ্বর্য ও মর্যাদা ভোগ করেছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমাজের সেই মুষ্টিমেয় সুবিধা-ভোগীদের সৃষ্টি। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সেদিন ছিল না, তাই শিক্ষা বা জ্ঞান যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কারণ নেই। প্লেটো এরিস্টটলের মতন মানবধর্মী উদার দার্শনিক সেদিন বলেছেন যে সমাজে চিরকালই প্রভু এবং দাস থাকবে, এবং দাসত্ব-প্রথার ফলে যে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি, তার ব্যবহার করেই অভিজাত সম্প্রদায় চারুশিল্প, দর্শন বিজ্ঞান সৃষ্টি করবে। ভারতবর্ষে মনুসংহিতায়ও অধিকার ভেদের ভিত্তিতে মানুষের সাম্যবোধ অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত আদর্শই যে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলে অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এরিস্টটলের লেখায় তার ইঙ্গিত মেলে। "পলিটিক্স" বা রাজনীতি গ্রন্থে এরিস্টটল লিখেছেন যে যতদিন নিজের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবে, ততদিন দাসত্ব প্রথা অনিবার্য, কিন্তু যদি কখনো এমন দিন আসে যে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারে কায়িক শক্তির প্রয়োজন কমে যাবে, যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এত অপর্যাপ্ত হবে যে কাউকে বঞ্চিত না করে সমাজের সমস্ত মানুষের দৈনন্দিন দাবী মেটাতে পারবে, সেদিন দাসত্ব প্রথারও আর যৌক্তিকতা থাকবে না।

গত দুশো বৎসরের শ্রমবিপ্লবের ফলে এবং বিশেষ করে বিগত পঞ্চাশ বছরের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে আজ সেই অসম্ভবই সম্ভব হতে বসেছে।

আজ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। পূর্বে দশজন লোক চরকা তাঁত চালিয়ে সারা বৎসরে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী করতে পারত, আজ যন্ত্রের সাহায্যে এক ঘণ্টায় একজন লোক তার শতগুণ বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। পূর্বে যে পথ অতিক্রম করতে বহু বৎসর কেটে যেত, আজ সেই পথে চলতে মানুষের ঘণ্টাভর সময়ও লাগে না। পূর্বে যে পাথর তুলতে বা সরাতে হাজার লোকের প্রয়োজন হত, আজ যন্ত্রের সাহায্যে একটি বালকও তা অনায়াসে যেখানে খুসী নিয়ে যেতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিস দেখি, শুনি, বহুদূরের মানুষকে সাহায্য বা সংহার করতে পারি। ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করবে, এ সম্ভাবনা আজ প্রথমবার পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ জরা ও মৃত্যুকেও বহুল পরিমাণে স্ববশে এনেছে। চিরকালের সনাতন অভাবের সমাজের বদলে আজ পৃথিবীতে সর্বদেশের সকল মানুষের জন্য সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত। তাই গণতন্ত্রের সম্ভাবনাও আজই প্রথম মানব ইতিহাসে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের সেই শাশ্বত মঙ্গল মানব আদর্শকে সাম্যবাদ যে পরিমাণে গ্রহণ করেছে, সেই পরিমাণেই সাম্যবাদ আদর্শবাদী তরুণের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আকর্ষণ করে।

আজ একথাও ভোলবার উপায় নেই যে মার্কস নিজে চরম আদর্শবাদী ছিলেন। মানবের কল্যাণ সাধনের প্রেরণায় সমস্ত জীবন দারুণ দুঃখ ও অভাব স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেকালের আদর্শবাদী উদার মানব-ধর্মকে ভিত্তি করেই তাঁর জীবন-দর্শন। শুধু সেই দর্শনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য যে হিংসামূলক কর্মপদ্ধতি তিনি সেদিন নির্দেশ করেছিলেন, সেই কর্মপদ্ধতি বাদ দিলে তাঁর পূর্বের উদারপন্থী মানব-ধর্মী দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তিনি ইতিহাসের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়াকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর পূর্বে রিকার্ডোও সে কথা বলেছেন। মার্কস একথাও বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের মতন গণতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদ হয়তো বিনা দ্বন্দ্বেই আসবে। একথা মেনে নিলে পৃথিবীর প্রায় সকল উদারপন্থী নরনারীই মার্কসের আদর্শবাদ গ্রহণ করতে পারে। গত একশো বছরের ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে কর্মপন্থা নির্দেশে মার্কস বহুক্ষেত্রে ভুল করেছেন। বিগত শতাব্দীর বিস্ময়কর

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রগতি তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ভাবতে পারেননি যে মানুষের জ্ঞানের সম্প্রসারণে মানবসমাজ একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছবে যে হিংসা বা সংঘর্ষের পথ প্রগতির বদলে অবধারিত মৃত্যু টেনে আনবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান নায়ক মিঃ ক্রুশ্চভের অন্যতম প্রধান কীর্তি যে তিনি মানব-সমাজের এ প্রগতির অর্থ বুঝেছেন, এবং তাই মার্কস বা লেনিনের মতবাদের নির্বোধ ও অর্থহীন পুনরাবৃত্তির বদলে নতুন পৃথিবীর নতুন সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজতে এগিয়ে এসেছেন।

"মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মনোভাবের যে পরিবর্তন, তার আলোচনায় যে সব কথা এসে পড়ল, প্রথম দৃষ্টিতে তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আধুনিক যুগে সোভিয়েট নাগরিকের যে আগ্রহ, এ আলোচনার মধ্যে তার কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে। মস্কোর কিশোর নাট্য প্রতিষ্ঠান রামায়ণ অভিনয় করতে চাইছে, বিদগ্ধ সমাজ "মুদ্রারাক্ষস" দেখে নিজেরা মুগ্ধ, সে অভিনয় বিদেশীকেও মুগ্ধ করে, কালিদাসের শকুন্তলাকে নাট্যরূপ, নৃত্যনাট্যরূপ দেওয়ার আগ্রহ, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে সরকারের এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যিক ও লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার ঔৎসুক্য, গান্ধীর কর্মপন্থা ও মতবাদ প্রথম দৃষ্টিতেই একেবারে মার্কসবাদ ও মার্কসপন্থার বিরোধী, তা সত্ত্বেও আজ সোভিয়েট দেশে গান্ধীর সমাদর, যে টলস্টয় ডস্টয়ভস্কি এককালে উপেক্ষিত অনাদৃত ছিলেন, আজ তাদের নতুন করে বোঝবার শ্রদ্ধা জানাবার চেষ্টা,—এ সমস্ত স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্র ছেড়ে দিলেও ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতির সমস্যা ও সমাধান নিয়েও সোভিয়েট নাগরিকের যথেষ্ট অনুরাগ। ভারতবর্ষের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে কেবল ভারতবর্ষের নেতা বলে সমাদৃত নন, সোভিয়েট নাগরিক আজ তাঁকে বিশ্বনেতৃবৃন্দের মধ্যে স্থান দিয়েছে এবং যে পরিমাণে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়েছে, তা অনেক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাও পাননি। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা সম্বন্ধে সোভিয়েট নাগরিকের ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা যেভাবে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে কথা মনে রাখলে

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তার আগ্রহ ও অনুরাগ বিস্ময়কর মনে হয়। সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের হৃদয়ে ভারতবর্ষের যে প্রভাব, এক আমেরিকা ভিন্ন অন্য কোনো ভিন্ন দেশের বেলা বোধ হয় তার পরিচয় মিলবে না।

আমেরিকা নিয়ে সোভিয়েট নাগরিকের উদ্বেগ ও আগ্রহ দুই-ই বোঝা যায়। বর্তমান যুগের পৃথিবীর নেতৃত্ব নিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং দুর্ভাগ্যবশত সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপকভাবে হিংসা ও শত্রুতার রূপ নিয়েছে। ফলে উভয় রাষ্ট্রের মনে ভয় যে প্রবল প্রতিপক্ষ অতর্কিত আক্রমণে জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সম্পদে, যান্ত্রিক অগ্রগতিতে বা সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা ও রুশদেশে ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, ভারতবর্ষের জীবন আদর্শই তার জন্য দায়ী। ভারতবর্ষ প্রধানত অহিংস উপায়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানও অহিংস উপায়েই করতে চেষ্টা করছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা এবং সাধারণ নাগরিক উভয়েই তা দেখে বিস্মিত হন। সাম্যবাদী দেশের সর্বনায়কদের মধ্যে একজন তো স্পষ্টভাবে বললেনই যে ভারতবর্ষের রাজামহারাজাদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন। ইয়োরোপের ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে যে অভিজাত সম্প্রদায় শক্তি সম্পদ হারিয়ে নতুন রাষ্ট্রশক্তির কঠোর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে সে শত্রুতা বংশানুক্রমে তিন-চার পুরুষ ধরে অব্যাহত রয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে অভিজাত সম্প্রদায় শক্তি সম্পদ হারিয়েও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত ও দেশভক্ত প্রজা, এ অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হল, সে কথার বিচার করে মার্কসবাদের মূলনীতি নিয়ে তাঁকে আবার ভাবতে হয়েছে, একথাও একাধিক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা স্বীকার করেছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ সমালোচক এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেন যে গত চার পাঁচ বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মতের কড়াকড়ি অনেকটা কমে গিয়েছে, শাসনের বজ্র আঁটুনিও খানিকটা আলগা হয়ে এসেছে। এ পরিবর্তনের মূলে ভারতবর্ষের প্রভাব যে কতখানি কার্যকরী তারও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

জওহরলাল নেহরু যেবার প্রথম সোভিয়েট রাষ্ট্রে যান, তখন সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা করেছিল, বোধ হয় লেনিনের মৃত্যুর পরে কোনো সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতার ভাগ্যে তা জোটেনি। সামরিক শক্তিতে দুর্বল, অর্থবলে দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর জন্য সোভিয়েট নাগরিকের এত শ্রদ্ধা ভালবাসার কারণ কি, এ কথার আলোচনা করলে বোঝা যায় যে রণ-ক্লান্ত হিংসানীতিশ্রান্ত শান্তিকামী সোভিয়েট জনসাধারণ তাঁর আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করেছে, স্বদেশের রাষ্ট্রনীতির প্রত্যক্ষ সমালোচনার সুযোগ বা সাহসের অভাব ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছে ; এই বিরাট সংবর্ধনার মাধ্যমে তারা দেশের নায়কদের বলতে চেয়েছে যে তোমরাও যদি ভারতবর্ষের নীতি অবলম্বন কর, তবে কেবল ভয়ার্ত আজ্ঞাবহ না হয়ে আমরা তোমাদের সশ্রদ্ধ ও অনুরাগী অনুচর ও সহকর্মী হব। মিঃ ক্রুশ্চভের মতন তীক্ষ্ণধী নেতা সোভিয়েট রাষ্ট্রে পণ্ডিত নেহরুর অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য অভিনন্দন দেখে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে ভেবেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত সন্দেহ তাঁর ভারত আগমনের পরে দূর হয়ে গিয়েছে। এদেশে আমাদের রাষ্ট্র নেতাদের অকুণ্ঠিত ও অবাধ চলাফেরা, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের যোগ নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ কথাও অনস্বীকার্য যে মিঃ ক্রুশ্চভের ভারতবর্ষে আসবার পর থেকেই সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন শুরু হয়েছিল।

মৌলিক জীবনদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে সোভিয়েট রাষ্ট্র যেমন ভারতবর্ষের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারে, শিখেছে, এবং শিখছে ভারতবর্ষও ঠিক তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা ও সাধনা থেকে অনেক শিখতে পারে, শিখেছে এবং শিখবে। বহুযুগের জড়তাকে স্বচেষ্টায় নিজের উদ্যমে যেভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্র জয় করেছে তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের বাহ্যিক প্রকাশ-গুলিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সোভিয়েট লুনিক সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, সোভিয়েট পতাকা চন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছে, এসব জিনিস স্বভাবতই আমাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই যে সমগ্রজাতির মধ্যে জ্ঞানসাধনার নবীন আগ্রহ ও উদ্যম সঞ্চারিত করতে না পারলে এসব কীর্তি সম্ভব হত না। শিক্ষা যেভাবে সমগ্র সেভিয়েট দেশে ছড়িয়ে পড়েছে,

সেকথা আগেও বলেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুন মানুষের নির্মাণ সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী সাধনা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে শিল্পে যে সংগঠনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি তারও ভিত্তি এই শিক্ষণ মনোবৃত্তি। সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাতে ক্ষতিও হয়েছে, কিন্তু মনে হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র সজ্ঞানে সে ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছে।

শিল্পসৃষ্টিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র কতখানি দখল দেবে, এ বিষয়ে আবহমান কাল থেকে মতভেদের অন্ত নেই। প্লেটোর কথা স্বভাবতই আমাদের মনে আসবে, কিন্তু একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে পূর্বকালে রাজানুগ্রহ না পেলে কবি বা সাহিত্যিক বাঁচতে পারত না এবং রাজাকে তুষ্ট না করলে সে অনুগ্রহ মিলত না। তবু সাহিত্য, চারুকলা বা সঙ্গীত প্রধানত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তাই তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ততটা মারাত্মক হয় না, আর বেশী হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তাকে অনধিকার চর্চা বলা চলে। নাট্যশিল্পের বেলায় সামাজিক ফলাফল অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, তাই নাটক এবং সমাজের চিত্ত বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমের উপর সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বদাই দখল দিতে চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগে সিনেমা বহুল পরিমাণে নাট্যশিল্পের জায়গা দখল করে নিয়েছে, তাই সিনেমার ক্ষেত্রে সমাজ হস্তক্ষেপ করতে চাইবে এটা বোধ হয় আশ্চর্য নয়। তাছাড়া সিনেমায় শিল্প এবং ব্যবসায়ের অনুপাত নিয়ে অনেক সময়ে মুশকিল বাধে। ভারতবর্ষেই আমরা দেখেছি যে এককালে শিল্প হিসাবে শুরু হলেও বর্তমানে সিনেমাকে ব্যবসায়ের পর্যায়ে ফেলাই বোধ হয় সঙ্গত। অবশ্য এখনো সিনেমার জগতে শিল্পীর পরিচয় মেলে, তা নইলে বোধ হয় সিনেমাও বেঁচে থাকতে পারত না, কিন্তু অধিকাংশ সিনেমার ছবিই আজকাল যারা সিনেমা হল ভাড়া দেয়, সেই সমস্ত ব্যবসায়ীর করুণা নির্ভর। তা ছাড়া সিনেমার প্রসারের সম্ভাবনা প্রায় অপরিমিত। নাট্যশিল্পে অভিনেতা বড় জোর হাজার দর্শকের সামনে বৎসরে তিন'শ বার উপস্থিত হতে পারেন, কিন্তু সিনেমা চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাকে একবারেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সিনেমা হলে একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন তিন চারবার করে দেখতে পারে। তাই সিনেমার মধ্যে দিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করবার শক্তিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছে। প্রায় সকল দেশেই তাই সিনেমার ছবির যাচাই করা হয়, সব ছবি

সকলকে দেখতে দেওয়া হয় না, কোন কোন ছবি রাষ্ট্রের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এমনিতেই নিয়ন্ত্রণ বেশী। কাজেই সিনেমাচিত্রের বেলায় যে রাষ্ট্র চিত্রের পরিচালনা, উৎপাদন এবং পরিবেশনকে নিজের হাতে রাখবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সোভিয়েট ছায়াচিত্র এই পুরো-পুরিভাবে দর্শকের রুচি নির্ভর নয়, সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয় কোন্ ছবি তৈরী করা হবে, কোথায় কতদিন দেখানো হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়। অবশ্য, ছায়া-চিত্রের বেলা প্রায় সব দেশেই কেবল দর্শকের রুচি দিয়ে চিত্রের ভাগ্য নির্ণয় হয় না। আজকাল নগরবাসীর একটি বিপুল অংশ সপ্তাহে একবার কি দু-বার সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত—যে ছবিই দেখানো হোক না কেন, তারা ছবি দেখতে যাবেই। কাজেই যারা সিনেমা হল নিয়ন্ত্রণ করে, তারা প্রায় খুসী মতন যে কোনো ছবিই দেখাতে পারে। অবশ্য দর্শকের রুচি ষোলো আনা অগ্রাহ্য করা চলে না, কিন্তু সময় সময় আমাদের দেশে অথবা আমেরিকায় সিনেমা ব্যবসায়ীরা যে দর্শকের দোহাই দিয়ে নিজেদের বিকৃত রুচি ও অপরিণত মনোবৃত্তি প্রসূত বাজে বা ক্ষতিকর ছবির সাফাই দিতে চেষ্টা করে, তা একান্তই অযৌক্তিক। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মর্জিমাফিক ছবিই উৎপাদিত হয়, দেখানো হয়। দু-একবার এমনো হয়েছে যে ছবি দেখাতে শুরু করে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তা সহসা বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ধরনের সরকারী নিয়ন্ত্রণে আশঙ্কা নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে খুব খারাপ বা কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখবার সম্ভাবনাও অনেকখানি কমে আসে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষের যৌন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে সিনেমাতে এসে পড়েছে, বহু ক্ষেত্রে তা শালীনতার সীমাও পেরিয়ে যায়, কিন্তু সোভিয়েট ছায়াচিত্রে কখনো সে ধরনের অসংযম দেখা যায় না। একথা বোধ হয় সত্য যে সোভিয়েট ছায়াচিত্রের সাধারণ মান বেশ উঁচু। পৃথিবীর অনেক দেশের ছায়াচিত্রের তুলনায় অধিকাংশ সোভিয়েট ছায়াচিত্র শিল্পসম্পদে উৎকৃষ্ট, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎকর্ষের সম্ভাবনাও খানিকটা সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে কিন্তু মহত্তম ছায়াচিত্রের বেলায় সোভিয়েট সিনেমা শিল্পের অবদান বোধ হয় জাপান বা ফরাসী বা হলিউডের শ্রেষ্ঠতম অবদানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীন।

সোভিয়েট দেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপরিমিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানেও দর্শকের রুচিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। ইংরাজীতে কথা আছে যে ঘোড়াকে টেনে নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া চলে কিন্তু জোর করে জল খাওয়ান যায় না। সোভিয়েট রাষ্ট্রেও তার পরিচয় দেখেছি। সোভিয়েট ফিল্ম অথবা টেলিভিশনে প্রচার কার্য বেশ জোরালোভাবে হয়, কিন্তু বহু-ক্ষেত্রে ফল হয় উল্টো। আমি নিজে দেখেছি যে টেলিভিশনে যেই প্রচার-বার্তা শুরু হল, গৃহকর্তা টেলিভিশন বন্ধ করে দিল, অথবা অধিকাংশ দর্শক সেখান থেকে উঠে চলে গেল। একজন সোভিয়েট নাগরিক তো স্পষ্ট বললেন যে প্রথম যেদিন টেলিভিশনে শুনলাম যে অমুক নদীতে বাঁধ বেঁধে এত লক্ষ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি স্মষ্টি হয়েছে, সেদিন খুবই খুসী হয়েছিলাম, গর্বও অনুভব করেছি, কিন্তু বারবার যদি সেই একই ধরনের খবরের পুনরাবৃত্তি হয় তবে তা আর কতদিন সহ্য করা যায়? তাই তখন নিজের বাড়িতে হলে টেলিভিশন বন্ধ করে দিই। হোটেলে রেস্তোরাঁতে বা অন্যের বাড়িতে হলে হয় উঠে চলে যাই, নয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিই।

দর্শকের রুচিমাফিক ছায়াচিত্র উৎপাদনের জন্য তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রও চেষ্টা করে। যে কোন নাগরিক মর্জিমাফিক ফরমায়েশ পাঠাতে পারে, অবশ্য সে অনুরোধ রক্ষা করা না-করা কর্তৃপক্ষের এক্তেয়ার। ব্যক্তি বিশেষের ফরমায়েশ হয়তো অগ্রাহ্য করা চলে, কিন্তু শিল্পীসংসদ লেখকগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সংস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেকটিভ ফার্ম থেকে অনুরোধ এলে কর্তৃপক্ষকেও ভাবতে হয়। শিল্পী হিসাবে হোক অথবা কর্মী হিসাবে হোক, সিনেমাশিল্পে যারা কাজ করে, তাদের অনুরোধগুলিরও বিশেষ ওজন দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এ সমস্ত মতামতকে দেশের জনসাধারণের রুচিরও খানিকটা পরিচয় মেলে এবং কর্তৃপক্ষ সবদিক বিবেচনা করে এমন ছায়াচিত্র রচনার চেষ্টা করেন যাতে দর্শকদের মনোতুষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আদর্শও প্রচারিত হবে।

সোভিয়েট সিনেমাশিল্পের আর একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশে চিত্রশিল্পীদের নিয়ে যে বাড়াবাড়ি, চিত্রতারকা তৈরী করবার জন্য সমস্ত রকমের প্রচারকার্যের প্রয়োগ, সোভিয়েট ছায়াচিত্রে তার পরিচয় খুবই কম।

এককালে তো অনামা চিত্রশিল্পীদের নিয়েই সোভিয়েট ছায়াচিত্র গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে চিত্রতারকাদের পরিচিতি অনেকটা বেড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও হলিউডের তুলনায় ব্যক্তি বিশেষকে বড় করবার চেষ্টা অনেক কম। বহুক্ষেত্রে নায়ক বা নায়িকার ভূমিকায় সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হয় এবং দু-একটি ছায়াচিত্রে অভিনয়ের পরে তারা আবার সাধারণ নাগরিকের জীবনে ফিরে যায়। হয়তো তার একটা কারণ যে এতদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছায়াচিত্র রচনায় রাষ্ট্রের প্রচারণার দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বল্প সংখ্যক ছবিই সমস্ত দেশে দেখানো হত। ভারতবর্ষের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক কম ছায়াচিত্র প্রতি বৎসর পরিবেশন করে, একথা হয়তো কারু কারু কাছে আশ্চর্য মনে হবে। বর্তমানে ছায়াচিত্রের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে এবং তার ফলে একদিন হয়তো হলিউডের ছায়া সোভিয়েট সিনেমা শিল্পেও দেখা দেবে।

ভারতীয় ছায়াচিত্রের সোভিয়েট রাষ্ট্রে খুবই সমাদর, কিন্তু ঠিক যেমন সঙ্গীতের বেলায় ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের চেয়ে আধুনিক ফিল্মী গানই সোভিয়েট নাগরিকের হৃদয় বেশী স্পর্শ করেছে, ছায়াচিত্রের বেলাও আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ফিল্মেরই বেশী সমাদর। হয়তো তার একটি কারণ যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কঠোর জীবন আদর্শ এবং সোভিয়েট ছায়া-চিত্রের তাপস মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় ছবির অপ্রাকৃত অতিরঞ্জিত প্রেম কাহিনী তাদের আরো বেশী আকর্ষণ করে। কারণ যাই হোক না কেন, ভারতীয় ছায়াচিত্র এবং ভারতীয় ফিল্মী গান যে সোভিয়েট জন-সাধারণের একান্ত প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বোধ হয় তার ফলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ একটু বিচলিত হয়েও পড়েছেন। কারণ আমি যখন মস্কোতে ছিলাম, তখন আমাদের সফির শ্রীমেনন একদিন অনুযোগ করলেন যে ভারতীয় ফিল্মের সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রবেশে নানা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অবশ্য তখনি বললেন যে তাঁরা চান যে আরো বেশী ভারতীয় ছায়াচিত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে আসুক এবং সরকারের তরফ থেকে যাতে বাধা না থাকে, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

রাষ্ট্রনেতাদের মতামত যাই হোক না কেন, জনসাধারণ যে ভারতীয়

ছায়াচিত্র দেখতে চায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শ্রী রাজকাপুর এবং শ্রীমতী নার্গিসকে সোভিয়েট দেশের সিনেমা দর্শকেরা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। সে সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পের উল্লেখ করে এবারের মত আলোচনা শেষ করছি। বিশেষজ্ঞদের কোন এক সভায় যোগদান করার জন্য ভারতবর্ষের কয়েকজন মনীষী তাসকন্দ হয়ে মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁরা সবাই খ্যাতনামা, নিজের নিজের ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাসকন্দে প্লেন থেকে নামবার সময় দেখলেন যে বিপুল জনতা সাগ্রহ প্রতীক্ষা করছে। তাঁরা বেরিয়ে আসতেই শুনলেন জয়ধ্বনি 'হিন্দী রুশি ভাই ভাই'। দেখলেন যে ভারতবর্ষের তেরাঙ্গা পতাকার ছড়াছড়ি। তাঁদের খুবই ভাল লাগল, ভাবলেন স্বদেশে কোন দিনই এ ধরনের অভ্যর্থনা তাঁদের মেলেনি। সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের এ নিদর্শন দেখে খুবই খুসী হলেন। একটু কাছে এসে দেখলেন কতগুলি ছবিও রয়েছে। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই সিনেমায় বড় বেশী যান না, তাই ছবি দেখে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু সমবেত জনতার মধ্যে কয়েকজন এগিয়ে এসে রাজকাপুর ও নার্গিসের জয়ধ্বনি দিল, তাঁদের জিজ্ঞাসা করল যে রাজকাপুর কোথায়? নার্গিস এখনো বেরিয়ে আসেননি কেন? জনতা যখন শুনল যে সে প্লেনে নার্গিস বা রাজকাপুর নেই, তখন পণ্ডিত ও সুধীদের নিরাশ করে সমবেতভাবে তারা সবাই ফিরে গেল। 'হিন্দী রুশী ভাই ভাই' জয়ধ্বনি থেমে গেল।

গল্পটি সত্য কিনা জানি না, কিন্তু এ ঘটনা না ঘটে থাকলেও ঘটতে যে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কার্তিক ১৩৬৭

॥ ছয় ॥

কলেকটীভ ফার্ম বা সমবেতভাবে চাষের ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বললে অত্যুক্তি হবে না। লেনিনের আমলেও রাষ্ট্র এবং সমাজ বিপ্লবে কৃষকের স্থান নিয়ে মতভেদ ছিল, সন্দেহ ছিল। সাম্যবাদী অনেক দার্শনিকরাই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিককে প্রগতিশীল ও বিপ্লবপন্থী এবং কৃষককে সংরক্ষণশীল ও বিপ্লব-পরিপন্থী মনে করতেন। লেনিন সে কথা পুরোপুরি মানেননি, কৃষককেও সেদিনকার রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবে ব্যবহার করেছেন বলেই তাঁর কর্মপন্থা সফল হয়েছিল। লেনিন-পরবর্তী যুগে স্টালিন এবং অন্যান্য রক্ষণশীল সাম্যবাদী নেতার মতকে অগ্রাহ্য করে মাওৎ-সে-তুং কৃষককে বিপ্লবের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যাঁরা ষোল আনা বিশ্বাস করেন, তাঁদের সকলেরই চেষ্টা পুরাতন কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন করে কৃষিকেও বর্তমান যুগের বিরাট শিল্প ও উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে হবে।

কৃষির শিল্পীকরণ হিসেবেই হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্রে কলখজ বা কলেকটীভ ফার্মের শুরু হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা অল্পদিনের মধ্যেই দেখলেন যে এ পরিবর্তনের ফলে বিপুল শক্তিশালী নতুন এক অস্ত্র রাষ্ট্রের হাতে এসেছে। সোভিয়েট-পূর্ব যুগেই রুশদেশে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজ অথবা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ রুশ শক্তিকে সর্বদাই সমীহ করে চলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি। বিপ্লবের পরে অন্তর্দ্বন্দ্বে কিছুদিনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে সোভিয়েট রুশে যখন পঞ্চশালা পরিকল্পনা শুরু হয়, তখন তার ফলে সমস্ত দেশে জনসাধারণের ধন উৎপাদনের শক্তি আবার দ্রুতবেগে বাড়তে শুরু করল। সে বৃদ্ধির অন্তত একটি অংশ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে এ আশা শুধু স্বাভাবিক নয়, প্রায় অনিবার্য। সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতারা নানা কারণে

স্থির করেছিলেন যে তা হবে না, বর্তমানকে বঞ্চিত করে ভবিষ্যৎ গড়বার কাজে নতুন সম্পদের সমস্তটাই ব্যবহৃত হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নয়, সেখানে যে রাষ্ট্র-সংগঠন, তাতে জনসাধারণের মতামত পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা আজো কঠিন, স্টালিনের যুগে একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও কোনকালে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত স্টালিনের আমলে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হয়, তখন কৃষক সমাজের অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাতে বাধা দিয়েছে। চাষী বহুক্ষেত্রে চাষ করেনি, ফসল নষ্ট করে দিয়েছে, গরু বাছুর মেরে কেটে খেয়ে ফেলেছে। ফলে সে সময় নগরবাসী শ্রমিকের খাদ্যসংস্থান রাষ্ট্রের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র বিরুদ্ধবাদী চাষীদের কঠিন শাস্তি দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ চাষী সর্বস্বান্ত হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু কেবল শাস্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না, তাই সেই শিল্পীকরণের যুগে শহরের কারখানার শ্রমিক যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়, তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কলেকটীভ ফার্ম বা কলখজ সেই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবেও সেদিন ব্যবহৃত হয়েছিল।

কলখজের পাশাপাশি বহু কো-অপারেটিভ বা স্বেচ্ছাসমবায় ফার্মও গড়ে উঠেছে। মনে হল যে বর্তমানে কলখজের চেয়ে কো-অপারেটিভ ফার্মের প্রসারই তাড়াতাড়ি হচ্ছে। কলখজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, কো-অপারেটিভেও তা পুরোপুরি মেলে, সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ ফার্মে স্বাধীনতার খানিকটা অবকাশ আছে বলে কৃষক সমাজ তাকে ততটা অপছন্দ করে না। তবে কলখজই হোক অথবা সমবায় ফার্ম হোক, এ সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে কৃষির শিল্পীকরণ। বহুদিন থেকে মানুষ দেখেছে, যে শিল্প এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে পুরাকালের ছোট ছোট পরিবার-নির্ভর গৃহশিল্প ভেঙে যেদিন কারখানার প্রবর্তন হল, সেদিন এক পক্ষে শিল্পের আয়তন ও উৎপাদন বেড়ে গেল অন্য পক্ষে যন্ত্রের অধিক ব্যবহারের ফলে শিল্পের গতিবেগ ও বর্ধনশক্তি বহুগুণ প্রসারিত হল। ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লব বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের এই হল গোড়ার কথা। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দিল, সমাজের সংগঠন বদলাতে শুরু

করল, পুরাতন বিচ্ছিন্ন গৃহনির্ভর গ্রাম্যসভ্যতার বদলে শিল্পনির্ভর এক নতুন বিশ্বব্যাপী নাগরিক সভ্যতার পত্তন হল।

কৃষির ক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বহু মনীষী বহুদিন থেকে ভেবেছেন। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতকের গোড়ায় বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের ছোটি ছোট ভাঙাচোরা জোতজমিকে একত্র করে আমরা যদি যন্ত্রের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা না করি, তবে কোনদিনই এদেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না। অবশ্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন, যে কৃষির এ প্রসারণের ফলে ব্যক্তিসম্পত্তি লোপের কোন প্রয়োজন নেই। স্বেচ্ছায় যদি চাষীরা সমবেত-ভাবে চাষের ব্যবস্থা করে, তবে তাতে সমাজের সম্পদ বাড়বে,' সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সম্পদও বাড়বে। যন্ত্র চাষের অর্থ কেবলমাত্র যন্ত্রের ব্যবহার নয়, বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে জমির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধিই তার লক্ষ্য। পূর্বে একশজন লোক যে পরিমাণ কাপড় সারা বৎসরে বুনতে পারত, আজকাল একজন লোক যন্ত্রের সাহায্যে এক সপ্তাহে তা বুনতে পারে। কৃষির ক্ষেত্রেও আজ তাই চেষ্টা যে সকলের সমবেত চেষ্টায় যন্ত্রের সাহায্যে এমন কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যে একজন লোকের পরিশ্রমে যেন দশজন লোকের সারা বৎসরের খোরাকের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম ইয়োরোপের অনেক দেশ অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তা হয়েছেও। সেখানে শতকরা দশ পনেরো জন লোক যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে, তাতে দেশের সমস্ত লোক পর্যাপ্তভাবে খেয়ে পরেও বিদেশে রপ্তানীর জন্য অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে।

কলখজ ও কো-অপারেটিভ ফার্মের দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রও সেই উদ্দেশ্য সফল করতে চায়, কিন্তু এখনো পুরোপুরি সফল হয়নি। বস্তুত, স্টালিন-যুগের রাষ্ট্র-নেতাদের ভুলভ্রান্তির জন্য বরং প্রথম প্রথম সোভিয়েট নাগরিকের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রুশ দেশের জনসাধারণ যে পরিমাণ খোরাক পোশাক পেয়েছে, স্টালিনের আমলে তা পায়নি। স্টালিনের মৃত্যুর পরেই এ বিষয়ে সোভিয়েট কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছে, এবং গত পাঁচ বৎসরে উল্লেখ-যোগ্য উন্নতিও করেছে। তবু আজো সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষি সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি, আজো বহু প্রয়োজনীয় জিনিস হয় মেলে না, নয়

দুর্মূল্য। কাপড় জামা জুতোর কথা ছেড়ে দিলেও জনসাধারণের তরীতরকারী ফলের চাহিদাও আজো সোভিয়েট রাষ্ট্র পুরোপুরি মেটাতে পারে না।

সোভিয়েট দেশে সফরের সময় উজবেকীস্তানে আমি দুটি কলেকটীভ ফার্ম দেখেছিলাম। একটি তাসকন্দের কাছে, অন্যটি সমরকন্দে। তাসকন্দের ফার্মটির নাম কার্ল মার্কস কলখজ, ১৯৩০ সালে তার প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় গোলাম মহম্মদ আবদুল্লা তার সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৯ সালে আমি যখন সেখানে যাই, তখনো তিনি সভাপতি। শুনলাম যে এভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে একটানা সভাপতিত্ব সারা সোভিয়েট রাষ্ট্রে বোধ হয় আর কেউ করেননি।

কার্ল মার্কস কলখজের আয়তন প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল হবে, দৈর্ঘ্য দশ মাইল, প্রস্ত তিন মাইল। কলখজে সাড়ে পাঁচশো পরিবারের বাস—জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সাবালক নরনারীদের মধ্যে ১০৫০ জন কলখজের সদস্য, বাকী ৩০০ শহরে কাজ করে। সদস্যদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব বাড়ি রয়েছে, যাদের নেই, অন্যান্য সদস্যেরা তাদের বাড়ি তৈরীতে সাহায্য করে, কলখজ থেকেও ঋণ দেওয়া হয়। অধিকাংশ বাড়িতেই দুটি শোবার ঘর, রান্নাঘর বসবার ঘর আলাদা। টেবিল চেয়ার বা অন্য কোন আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের মতন উজবেকিস্তানেও অধিকাংশ লোক মাদুর বা তোষক বিছিয়ে মাটিতে শোয়, জমিতে বসে খায়।

কার্ল মার্কস কলখজে ব্যাপকভাবে আঙুরের এবং শাক-সবজী তরী-তরকারীর চাষ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুপালনের ব্যবস্থাও রয়েছে এবং দুধ মাখন পনিরও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। পূর্বেই বলেছি যে আজো সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ সমস্ত জিনিসের অভাব, কাজেই কলখজের সমস্ত উৎপাদনই অনায়াসে বিক্রি হয়ে যায়। পূর্বে কলখজ বা কো-অপারেটিভ ফার্মের সদস্যদের অভিযোগ ছিল যে বাধ্যতামূলকভাবে শহর বা কারখানায় খোরাক জোগাতে হত, ফলে তারা ফসলের উপযুক্ত দাম অনেক সময়ে পেত না। মিস্টার ক্রুশ্চভ আজকাল তাদের বিক্রয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে প্রায় সর্বত্র চাষীর উপার্জন অনেক বেড়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে মিস্টার ক্রুশ্চভের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণও তাই। সদস্যেরা কাজের হিসাবে বেতন পায়।

কে কতঘণ্টা কাজ করল তার হিসাব না করে কে কতখানি উৎপাদন করল সেই ভিত্তিতেই মজুরী বাঁটা হয়। কলখজের কমিটি স্থির করে যে একদিনে সুস্থ ও সক্ষম একজন কর্মীর আট ঘণ্টা মেহনতে এতখানি ফল পাওয়া উচিত এবং তার জন্য মজুরী এত রুবল হলে ঠিক হয়। সেই সময়ের মধ্যে যদি কারু উৎপাদন বেশী হয়, সেই অনুসারে তার রুজিও বেড়ে যায়। কলখজের সভাপতি বললেন যে তাঁরা স্থির করেছেন যে উপরে লিখিত মান অনুসারে পুরোদিনের কাজের জন্য বিশ রুবল দেওয়া হবে, এবং সে হিসাব অনুসারে তিনি নিজে গত বৎসর দুই হাজার কর্মদিবসের ভিত্তিতে চল্লিশ হাজার রুবল উপার্জন করেছেন। তিনি আরো বললেন যে সকলের মজুরী দিয়েও গত বৎসর কলখজটি এক কোটি রুবল মুনাফা করেছে।

প্রথম যখন কলখজগুলি শুরু হয়, তখন ব্যক্তি-সম্পত্তি লোপ করবার চেষ্টাও হয়েছিল। তার ফলে কৃষির উৎপাদন এককালে খুবই কমে যায়। ১৯৩০ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে বার বার বিক্ষোভের কথা শোনা যায়, লক্ষ লক্ষ চাষীর ঘরবাড়ি উৎখাত হয়েছিল, বার বার বহু নাগরিকের নানাভাবে শাস্তি হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও হয়েছে, কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর তার অন্যতম কারণ। সে সময়ের নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যেও কিন্তু জনসাধারণ ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করেনি। রাষ্ট্রশক্তি কেবলমাত্র দণ্ডবিধান দিয়ে মানুষকে শান্ত রাখতে পারত না, বর্তমানের দুঃখের মধ্যেও জনসাধারণ ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের স্বপ্ন দেখেছে বলেই তারা এত দুঃখ কষ্ট এভাবে সহ্য করেছে। সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থাও এবিষয়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করেছে। আশৈশব নাগরিক শিখেছে যে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা এবং গৌরবের জন্য দুঃখ স্বীকার এমনকি জীবনদানও নাগরিকের কর্তব্য। তারপরে যখন নাৎসি জার্মানী সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করল তখন স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় সাধারণ সোভিয়েট নাগরিক অসাধারণ ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

যুদ্ধের প্রাক্কালে স্টালিনও বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র শক্তির দ্বারা শাসন করা যায় না। তাই ১৯৩৬ সালের সংবিধানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও খানিকটা বদল শুরু হয়। অবশ্য সে সংবিধান সত্যিকার ভাবে কার্যকরী কোনদিনই হয়নি। তা সত্ত্বেও কলখজে সেই সময়ে ব্যক্তি সম্পত্তির স্বীকৃতি দেখা দেয়,

এবং ভবিষ্যতে কলখজের বদলে সমবায় চাষের দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে কলখজের প্রায় সমস্ত সদস্যেরই খানিকটা নিজস্ব জমি এবং নিজের গরু বাছুর রয়েছে। জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়, বোধ হয় প্রতি পরিবারের ভাগে আন্দাজ ১৫০০ বর্গ গজ জমি হবে। শুনেছি যে বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত জমির শতকরা ৯৫ ভাগ কলখজ বা সমবায় চাষে ব্যবহৃত, মাত্র শতকরা পাঁচভাগ জমি বিভিন্নভাবে চাষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তবু ব্যক্তিগত চাষের জমিতেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত ফসলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়। কলখজের কর্তারাও স্বীকার করলেন যে চাষীদের নিজস্ব জমিতে যে ফসল হয়, তাদের বাড়ির গরু ছাগল যে পরিমাণ দুধ দেয়, তা সাধারণত কলখজের উৎপাদনের হারের চেয়ে অনেক বেশী।

যুগোশ্লাভিয়া বা বুলগেরিয়ায় এ কথার স্বীকৃতি আরো বেশী স্পষ্ট। যুগোশ্লাভিয়া সাম্যবাদী দেশ, মার্শাল টিটো এবং তাঁরা সহকর্মীরা দাবী করেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তবু সাম্যবাদের ব্যতিক্রম ঘটেছে, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া মার্কসবাদকে আরো বেশী বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসরণ করে। তা সত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়ায় চাষের জমির অধিকাংশ চাষীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু চাষের ব্যবস্থা সকলের সম্মতিক্রমে সমবায় পদ্ধতিতেই হয়। বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি যে কলখজের চেয়ে সমবায় চাষের প্রতি ঝোঁক ঢের বেশী, এবং একথাও অনস্বীকার্য যে কৃষির ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়া উভয় দেশই সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। শুনলাম যে বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি এক নতুন বিকাশ দেখা যাচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত সমবায় চাষের ব্যবস্থায় চাষী শ্রমিক হিসাবে মজুরী উপার্জন করত এবং সমবায় ক্ষেত্রের আংশিক মালিক হিসাবে জমির খাজনাও পেতো, কিন্তু শুনলাম যে দু-এক বছর থেকে কোন কোন সমবায় সমিতির সদস্যেরা স্বেচ্ছায় স্থির করেছেন যে তাঁরা মালিকানার ভিত্তিতে খাজনা নেবেন না, কেবল মজুরী হিসাবে যা পাবেন তাই দিয়ে সংসার চালাবেন। খাজনার অংশ সমিতির তহবিলে জমা হয়ে সকলের সমবেত সম্পদ দিন দিন বাড়াবে।

মানুষ বিশদ-আপদের কথা ভেবেই সম্পত্তি অর্জন করে। ভাবে যদি এমন দিন আসে যে নিজের পরিশ্রমে আর জীবিকানির্বাহ করতে পারবে না,

তখন অন্তত সম্পত্তি ভাঙিয়ে দিন চলবে। কাজেই সমাজ-ব্যবস্থা যদি সকলের ভরণ পোষণের ভার নেয়, মানুষের মনে এ আশ্বাস গড়ে উঠে যে রোগে দুর্দিনে বা বৃদ্ধ বয়সে জীবিকার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নেই, তবে সম্পত্তি সঞ্চয়ের আগ্রহও স্বভাবতই কমে আসবে। যা দুর্লভ বা যার প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, তাই মানুষ সঞ্চয় করতে চায়। যা সহজলব্ধ এবং নিশ্চিত, তা সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের আগ্রহ কোনদিন কারুরই হয় না যে দেশে জলের অভাব নেই, সেখানে কেউ জল জমিয়ে রাখে না, অথচ সে দেশেও যদি কোনদিন জলকষ্ট দেখা দেয়, যেন জলসংগ্রহের আগ্রহ সকলের মধ্যেই প্রবল হয়ে উঠে। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কল্যাণে সমস্ত মানুষের জন্য সুস্থ স্বচ্ছন্দ এবং সচ্ছল জীবিকার ব্যবস্থা মানুষের করায়ত্ত। কাজেই সম্পত্তিবোধ এবং সঞ্চয়স্পৃহা যদি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে তো আশ্চর্যের কারণ নেই।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে কলখজগুলি কেবলমাত্র শস্য উৎপাদনের জন্য সংগঠিত হয়নি, তাদের মাধ্যমে সমাজজীবনের রূপান্তরের চেষ্টাও সমান স্পষ্ট। কার্ল মার্কস কলখজে কিণ্ডেরগার্টেন তো রয়েছেই, তাছাড়া তিনটি স্কুল এবং ক্লাব লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও রয়েছে। একজন সদস্য ভারতীয় ফিল্ম দেখে ভারতীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন, ক্লাবের সবাই মিলে আমাদের একটি ভারতীয় রাগিণী বাজিয়ে শোনালেন। কিণ্ডেরগার্টেন থেকে শুরু করে থিয়েটার লাইব্রেরী ক্লাবের মধ্যে দিয়ে কলখজগুলি সদস্যদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে খানিকটা শিথিল করে কলখজের সামষ্টিক জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তোলে।

কলখজগুলির পরিচালনার জন্য যে বোর্ড, তার সদস্যসংখ্যা সাধারণত এগারো। কলখজের সমস্ত মেম্বর মিলে দু-বছরের জন্য বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করেন, সভাপতিও সমস্ত কলখজের দ্বারা নির্বাচিত হন। হিসাব নিকাশের জন্য অর্থকরী সমিতি রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা পাঁচ। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বোর্ড ও অর্থকরী সমিতির সদস্য হতে পারেন না। বস্তুত বোর্ড এবং সমিতি পরস্পরের কাজের তুলনামূলক হিসাব রাখে। বোর্ড এবং সমিতির মধ্যে যদি কোন বিষয়ের মতভেদ হয়, তবে কলখজের সমস্ত সদস্যের সভা ডাকা হয় এবং সে সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

প্রায় সমস্ত কলখজেই এই ধরনের সাধারণ ব্যবস্থা। তবে স্থানীয় পার্থক্যেরও দৃষ্টান্ত মেলে। তাসকন্দের কলখজে 'কর্মদিবস'-এর বেতন কুড়ি রুবল কিন্তু সমরকন্দের পনেরো। আমি যখন তাসকন্দে গিয়েছিলাম, তখন এক রুবলের বদলে আমাদের আট আনা মিলত, কিন্তু জিনিসপত্রের হিসাবে রুবলের ক্রয়শক্তি তখন বড়জোর তিন চার আনা ছিল। তাই বলা চলে যে একদিনের মেহনতে তাসকন্দের চাষী আন্দাজ চার পাঁচ টাকা রোজগার করত, সমরকন্দে তিন চার টাকা। টাকার হিসাবে এ উপার্জন খুব বেশী নয়, কিন্তু কলখজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, আমাদের দেশে ব্যক্তিগতভাবে চাষীর পক্ষে তা পাওয়া দুষ্কর।

কলখজ হোক অথবা কো-অপারেটিভ হোক, তাদের প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে যেভাবে জোরজার চলত, তাতে কৃষক বহুক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, কখনো কখনো বিদ্রোহও করেছে। তবু কলখজের প্রভাবে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এসিয়া অঞ্চলে সাধারণ কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য কোন রাজ্যে আমি কলখজ দেখিনি, কাজেই ইয়োরোপীয় অঞ্চলে কলখজ কতখানি সার্থক হয়েছে বলতে পারি না। উজবেকিস্তানে যা দেখেছি তাতে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে ত্রিশ বৎসর আগে চাষীর কি মনোভাব ছিল জানি না কিন্তু বর্তমানে উজবেক চাষী কলখজকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছে এবং কলখজের কল্যাণে কৃষকের জীবনের মান অনেকভাবে উন্নত হয়েছে। পূর্বে কলজজেই হোক অথবা কো-অপারেটিভে হোক সমস্ত কৃষিজাত পণ্য বাঁধা দরে রাষ্ট্রের কাছে বিক্রয় করতে হ'ত, ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তিতে চাষেও বাধা ছিল অনেক বেশী। বর্তমানে কৃষিজাত পণ্য ফার্ম অথবা চাষী সুবিধামত দরে বিক্রি করতে পারে। নিজের জমিতে চাষের অনেকখানি স্বাধীনতা পেয়েছে। মিস্টার ক্রুশ্চভের আমলে পূর্বের এ সমস্ত অনেক অসুবিধা দূর হয়ে গেছে বলে বর্তমানে চাষীও কলখজকে আরো আগ্রহে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার অভিজ্ঞার সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার তুলনা করে ভারতবর্ষে যদি আমরা স্বেচ্ছামূলক ভাবে কো-অপারেটিভ ফার্মের প্রবর্তন করতে পারি, তবে ভারতবর্ষের কৃষিতে যে বিস্ময়কর প্রগতি দেখা দেবে, একথা নিঃসন্দেহ।

বৈশাখ ১৩৬৮

॥ সাত ॥

সোভিয়েট জীবনের বিভিন্ন দিকের খানিকটা আলোচনা পূর্বে করেছি, কিন্তু তার বিচিত্র প্রকাশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার জন্য যে সময় ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, তার সুযোগ পাইনি। প্রথম বার মস্কোতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, কিন্তু তার চার সপ্তাহ কেটেছিল হাসপাতালে। দ্বিতীয় বার তিন সপ্তাহে অনেকখানি ঘুরেছিলাম, কিন্তু তিন সপ্তাহে এত বিপুল দেশের বিচিত্র নরনারীর সম্যক পরিচয় কি করে মিলবে? তবু মস্কো লেনিনগ্রাডের আবহাওয়ার পার্থক্য, কিয়েভে উক্রেনবাসীর দিলখোলা আলোচনা এবং তাসকন্দে মধ্য এশিয়ার চিরপ্রসিদ্ধ আতিথেয়তা সঞ্চরমান পথিকের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে! তৃতীয় বার মোটে চারদিন ছিলাম। সমস্ত সময় মস্কোতেই কেটেছে। কিন্তু তার মধ্যেই মস্কোর বাহ্যিক রূপান্তর ও মানসিক পরিবর্তন আরো স্পষ্টভাবে দেখেছি।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে পরিবর্তন শুরু হয়, প্রথমবার তার বিশেষ কোন বাহ্যিক প্রকাশ দেখিনি। হয়তো দেখা সম্ভবও ছিল না। ভারতবর্ষ থেকে ফেরার অল্পদিন পরেই ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিস্টার ক্রুশ্চভ নতুন সোভিয়েট নীতি ঘোষণা করেন। আমি গিয়েছিলাম সে বছরই সেপ্টেম্বর মাসে। ছয়মাসে বিগত প্রায় ত্রিশ বছরের একটানা প্রবাহ বদলাবে কি ভাবে? কিন্তু ১৯৫৯ সালে যখন দ্বিতীয় বার গেলাম, তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। দোকান বাজারে নানাধরনের জিনিসপত্র বাড়তে শুরু করেছে, পথে লোক-চলাচল আগের তুলনায় বেশী। পথচারী স্ত্রী-পুরুষের পোশাকে কথায় ব্যবহারে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিপ্লবের প্রথম যুগে সোভিয়েট নাগরিক জীবনকে উপভোগ করবার কথা ভাবেনি, হয়তো ভাবতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে সেই পূর্বের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার ছবিই দেখেছি কিন্তু ১৯৫৯ সালে তিন বছরের মধ্যে দেশের বাইরের চেহারা ও জনসাধারণের মনোভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে মনে হ'ল। ১৯৫৯ সালে

যে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, এবারে ১৯৬১ সালে যখন মস্কো গিয়েছিলাম তখন তার প্রভাব আরো গভীর এবং সুদূরপ্রসারী দেখলাম। পূর্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র বা মার্কসবাদের কোন সমালোচনা করলে আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যেতো দেখেছি, এবার দেখলাম যে রুশ নাগরিক নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং জীবনদর্শনের আলোচনা করছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিষয় কিছু বলতে বা লিখতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা রূপ নিয়েছে, মানুষের জীবন দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গি বদলিয়েছে। সেই রক্তাক্ত বিপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে ও নিয়েছে। অন্তর্যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ফলে জাতির ও সমাজের জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে, পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হয়ে গিয়েছে, ঘরবাড়ি ক্ষেত কারখানা সম্পত্তি ধ্বংস ও জাতির অর্থসম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। গৃহশত্রু ও বহির্শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করে শিশুরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল সেদিন রাষ্ট্রনেতাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই জাতির সমস্ত উদ্যম ও শক্তি আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিস্ময়কর প্রগতির মূলে আত্মরক্ষার এই তীব্র প্রেরণা।

আত্মরক্ষার তাগিদে যুদ্ধবিদ্যার উপরে এত জোর দেওয়ায় কিন্তু জীবনের অন্যান্য অনেক দিকে ক্ষতি হয়েছে। আভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে পুলিশী-ব্যবস্থা, তাতে ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আঘাত পেয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বহুভাবে ব্যাহত হয়েছে। বহির্শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বহু সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করতে হয়েছে, রাষ্ট্রের জীবনে সামরিক শৃঙ্খলার বন্ধন কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। হিংসা ও দ্বন্দ্বের পথে সামাজিক পরিবর্তনকে আহ্বান করার ফলে দেশের ভিতরে এবং বাইরে এমন হিংস্র ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রায় চল্লিশ বৎসর শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সবাইকেই তার জন্য নিদারুণ দুঃখভোগ করতে হয়েছে। লেলিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই যে ত্রিশ বৎসর সোভিয়েট জনসাধারণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম জাতিই সে রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তাতে জয়লাভ করেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের খোরাক-পোশাকের আজো পুরোপুরি ব্যবস্থা হয়নি। শুধু যে সমস্ত জিনিস দুর্মূল্য তা নয়, যে সব জিনিস পাওয়া যায়, স্বাস্থ্যের বিচারে গ্রহণযোগ্য হলেও রুচির বিচারে তাদের স্থান অতি সাধারণ। পাঁচ বছর আগে দেখেছি যে রুশ নাগরিকের ঘরবাড়ি পোশাক অতিশয় মামুলী, জনসাধারণের অনেকের ভাগ্যেই যে খোরাক জোটে, তাতে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। খাস মস্কোর বড় বড় হোটেলে রুশ খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ কদর নাই। তুর্কী বা উক্রেনী বা তাজিক খাদ্যদ্রব্যেরই সমাদর বেশী। ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব রন্ধনপ্রণালীর পরিচয় মেলে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের রুশ অঞ্চলে তা নেই কেন্ বোঝাতে গিয়ে একজন সম্মানিত রুশ নাগরিক বললেন যে ১৯৩০-৩৭ সাল তাঁদের যে কি দুর্দশায় কেটেছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ তার কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি বললেন যে তাঁর নিজের বাড়িতে অনেক সময়ে ঘাস পাতা সেদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। প্রথম যুগের পঞ্চশালা পরিকল্পনার জন্য মূলধন যোগাতে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়েছে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ মেলেনি। ১৯৩৭ সালের পরে যখন অবস্থার একটু উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন ঘনিয়ে এল মহাযুদ্ধের কালো ছায়া। হিটলারের আক্রমণে রুশে যে ধ্বংসলীলা, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর বেশী মিলবে না। পূর্বের দশ বৎসর মানব-জীবনের অন্য সমস্ত দাবী ভুলে গিয়ে কেবল আত্মরক্ষার সাধনা একাগ্রভাবে না করলে বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র নাজী জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করতে পারত না।

বিপ্লবের পথে সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল বলেই সোভিয়েট নাগরিককে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। বিপ্লবের ভয়ে অন্য দেশ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। শুধু তাই নয়। বিশ্ব-বিপ্লবের আহ্বানে অন্যান্য রাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শত্রু মনে করেছে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অস্ত্রসজ্জা বাড়াতে বার বার বাধ্য হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামের দরুন দেশের অভ্যন্তরেও বিবাদ ও সংঘাত দেখা দিয়েছে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রথম ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর কেবল আত্মরক্ষারই সাধনা করেছে,

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তেমন মনোযোগ দিতে পারে নি।

ভারতবর্ষেও কখনো কখনো বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনা শোনা যায়। বিপ্লববিলাসী কেউ কেউ বলে থাকেন যে সংস্কারের পথ বর্জনীয়, রক্ত-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তাঁরা ভুলে যান যে সংস্কারের পথে চলেছে বলেই ইংরেজ সংখ্যায় অল্প হয়েও পৃথিবীতে বহুকাল আধিপত্য করেছে। বিপ্লবের পথে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ হানি তো রয়েছেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় যে তার ফলে অন্তর্শক্তি ও বহির্শক্তির আক্রমণ রোধ করতেই জাতির উদ্যম ও শক্তির বহুল অপব্যয় হয়। ব্যক্তির জীবনে সংঘাতের চেয়ে সহযোগের পথ বাঞ্ছনীয়—জাতির জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বিপ্লবের পথে চললে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা তো রয়েছেই, তা ছাড়াও সংঘাত সংঘর্ষে সৃষ্টিকারী শক্তির অপব্যয় অনিবার্য। অন্য সমস্ত বিচার ছেড়ে দিলেও সংঘর্ষের পথে বহুজনের জীবনে যে দুঃখ বেদনা গ্লানি, তাও সমাজের পক্ষে কম লোকসান নয়। মানব সমাজে পরিবর্তন আনবার উপায় হিসাবে বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনা ***Science, Democracy and Islam*** গ্রন্থে আমি বিস্তারিত ভাবেই করেছি এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। শুধু এই কথা বললেই চলবে যে পূর্বকালে যদিও বা বিপ্লবের স্বপক্ষে কথা বলা চলত, বর্তমান যুগের পৃথিবীতে সে সব কথা একেবারে অচল। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে মানুষ যে সমস্ত ভয়াবহ অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, সেই অস্ত্র-কণ্টকিত পৃথিবীতে বিপ্লবের পথে চললে মানবজাতির মৃত্যু অনিবার্য। রুশ রাষ্ট্রনেতা ক্রুশ্চভ সে কথা উপলব্ধি করেছেন বলেই আজ তিনি স্টালিনের পথ বর্জন করে লেনিনের মতবাদের সংশোধন দাবী করেছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমস্ত সংঘাত জয় করে সোভিয়েট রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর প্রগতি দেখিয়েছে, ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে হজরৎ মহম্মদ সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি যে জোর দিয়াছিলেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মেলে না। ফলে আরব জাতি যেভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে গিয়েছিল, তা আজও আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। রুশ বিপ্লবের পরে রুশ রাষ্ট্র-

নেতারাও সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন, এবং তাঁদের সে চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে বলেই আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞানে শিল্পে শিক্ষায় পৃথিবীতে অগ্রণী। শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্র জাতি ধর্ম বর্ণের প্রভেদ করেনি, উন্নত অনুন্নতের মধ্যে পার্থক্য রাখেনি। সমগ্র রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য নিজের ভাষায়· শিক্ষার ব্যবস্থা করে সকলের সামনেই উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে। প্রায় সমস্ত সমাজেই শতকরা চার-পাঁচ জন শিশু মেধাবী, কিন্তু বহু সমাজে দারিদ্র্য বা অন্য সামাজিক কারণে তাদের মধ্যে বড় জোর দু-একজন শিক্ষা ও উৎকর্ষের সুযোগ পায়। সোভিয়েট-পূর্ব রুশ দেশে সমাজের শতকরা একজনেরও এ সুযোগ মিলত কিনা সন্দেহ। আজ সকলের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বলে এই নিদারুণ সামাজিক অপচয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে পূর্বের তুলনায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক শিল্পীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে প্রায় দুই দশক ধরে অন্তর্দ্বন্দ্ব থামেনি, কিন্তু হিটলারের আক্রমণের ফলে দেশরক্ষার আহ্বানে সোভিয়েট নাগরিক যে ভাবে সাড়া দিয়েছিল তাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুল পরিমাণে দূর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের সংখ্যা বেড়ে চলল, বয়স্কদের মনে প্রাক-বিপ্লবদিনের স্মৃতি মলিন হয়ে আসতে লাগল। কিশোর যারা যৌবনে পা দিল, তাদের সমগ্র জীবন বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েট রাষ্ট্রে কেটেছে বলে তাদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের সম্ভাবনা রইল না। আরেক ভাবেও সোভিয়েট নাগরিকের জীবন সহজ হয়ে আসল। লেনিন-ট্রট্স্কী-স্টালিন যুগের যারা মানুষ, সেদিনকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদের মনকে যে ভাবে দোলা দিয়েছে, বর্তমান যুগের সোভিয়েট নাগরিককে তা দেয় না, দিতে পারে না। মস্কোতে একজন বিচক্ষণ সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতার সঙ্গে আলোচনায় এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল যে মিস্টার ক্রুশ্চভ যে ভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত করেই তুষ্ট হয়েছেন, তাঁদের দৈহিক মানসিক বা আর্থিক কোন ক্ষতির চেষ্টাও করেননি, স্টালিনের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ক্রুশ্চভ-পরবর্তী যুগে যাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার স্থান অধিকার করবেন, তাঁদের পক্ষে স্টালিনের কার্যকলাপ সমর্থন তো দূরের কথা, বোঝা-ই হয়তো কঠিন হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, আর একটি দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বর্তমান যুগ যে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানের যুগ, সে কথা সোভিয়েট শিক্ষা পদ্ধতি যে ভাবে স্বীকার করেছে, অন্যদেশে বোধ হয় তা হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নয় বৎসর বয়সেই সোভিয়েট ছাত্র বিজ্ঞান শিখতে শুরু করে, চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছয় বৎসর বিজ্ঞান প্রত্যেকেই পড়ে। চোদ্দর পরে যারা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, তারা আরো তিন বৎসর বাধ্যতামূলক ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিজ্ঞানে পারদর্শী, এবং বিজ্ঞানের এই ব্যাপক প্রসারের ফলেই রসায়ন পদার্থবিদ্যা জীববিদ্যায় সোভিয়েট রাষ্ট্র বিস্ময়কর প্রগতি দেখিয়েছে।

বিজ্ঞানকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ করায় কেবল যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সূত্রের জ্ঞান বেড়েছে, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যকলা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, দশ বৎসর পূর্বে স্টালিনের আমলে তা কল্পনার অতীত ছিল। স্টালিনের মৃত্যুতে এক যুগের অবসান এবং অন্য যুগের শুরু, কিন্তু বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়লে বর্তমানের এ বিকাশ সম্ভব হত না। এখনো নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন পুরোপুরি দানা বাঁধেনি, কিন্তু যে ভাবে নানা প্রশ্ন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, তাতে দশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুন রেনেসাঁস দেখা দেবে আশা করা যায়। সোভিয়েটের একজন রাষ্ট্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি, সমস্ত দেশে ব্যাপক বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে তাই একদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পূর্বসিদ্ধান্ত মার্কসবাদ নিয়েই জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয়। উত্তরে তিনি বললেন যে ভবিষ্যতের সোভিয়েট নাগরিককে বর্তমান যুগের উপযোগী করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য, তার ফলে যদি একদিন মার্কসবাদের কোন সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে।

মিস্টার ক্রুশ্চভের নেতৃত্ব সোভিয়েট নাগরিক যে এত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করেছে তার অন্যতম কারণ যে তিনি আশাবাদী। সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সবলকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ভিন্নও

সমাজব্যবস্থার রূপ বদলাতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘাতের বদলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি জনসাধারণের জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন। সামরিক শক্তির দ্বারা নয়, প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসের প্রাচুর্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র একদিন ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিকে পরাজিত করবে, সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামনে এই আদর্শ স্থাপন করে মিস্টার ক্রুশ্চভ দুইভাবে দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। সোভিয়েট নাগরিক যুদ্ধের দুঃখবেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, তাই যুদ্ধের নামে তার মনে আতঙ্ক আসে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে যতদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হয়েছে, ততদিন সোভিয়েট নাগরিক জীবনের নানাক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখেও আশ্বস্ত হতে পারেনি। তার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল যে বিজ্ঞানে শিল্পে উদ্যোগে এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও দেশ আণবিক যুদ্ধের আঘাতে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। একদিকে শস্ত্র-শক্তি বাড়িয়ে এবং অন্য পক্ষে যুদ্ধ বর্জনের সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে মিস্টার ক্রুশ্চভ সোভিয়েট নাগরিকের নিত্যসঙ্গী আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্ক দূর করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-আমোদপ্রমোদে কুড়ি বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে এই আশার ছবি সোভিয়েট নাগরিকের সামনে উপস্থিত করে তার প্রাণে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছেন।

সমরবিজ্ঞান ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্টালিনের আমলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় জীবনে বোধ হয় এই ক্ষেত্রেই স্টালিনের দান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমর সম্ভারের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্টালিন কিন্তু যে দাম দিয়েছিলেন, সোভিয়েট নাগরিক কোনদিনই তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও সংঘর্ষে তা বারঁবার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু স্টালিন কঠোর ভাবে সমস্ত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দমন করেছেন, যুক্তিযুক্ত সমালোচনাকেও স্বীকার করেন নি। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতাদের পুরোপুরি একটা গোষ্ঠী হয় বিদ্রোহ অথবা আত্মঅবলুপ্তির মধ্যে নষ্ট হতে বসেছিল, কিন্তু হিটলারের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে জাতির সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ বহিশত্রুকে পরাজিত করতে উন্মুখ

হয়ে উঠল বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নূতন নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েকমাসেই পুরাতন নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন রাষ্ট্ররক্ষার জন্য যে নতুন নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন, স্টালিনের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রশক্তি তাঁদের হাতে স্বভাবতঃই এসে পড়ল।

যুদ্ধের সময়ে স্টালিনের আমলেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন শুরু হয়, তার ফলে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির এক নতুন মূল্যায়ন হ'ল। রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে প্রাক-বিপ্লব যুগের প্রায় সব কিছুই অস্বীকার করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুরু হল। যে পিটরের নাম এককালে বিপ্লবী রুশ শুনতেও চায়নি, পেট্রোগ্রাডের নাম বদলে লেনিনগ্রাড হয়েছে, পরবর্তী কালে সেই পিটরকেই জাতির শ্রেষ্ঠতম নেতাদের সামিল করা হল। শুধু রাজনীতি বা ইতিহাস বলে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্বজাতিপ্রীতির দাবীতে বহু বিস্মৃতপ্রায় মনীষী এবং অপ্রচলিত জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের সজ্ঞান প্রচেষ্টা শুরু হল। আজকাল বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব রুশ পূর্বসূরীর সাধনার ফল বলে দাবী করা হয়। তাতে একপক্ষে বর্তমান যুগের সোভিয়েট নাগরিকের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় গর্ব বাড়ে, অন্যপক্ষে সোভিয়েটপূর্ব রুশ জীবনের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান ও গবেষণার প্রেরণা যোগায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। রুশ চিকিৎসাবিজ্ঞান একদিকে নিত্যনূতন আবিষ্কারে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, বহু দুরারোগ্য ব্যাধির আঁধি খুঁজে পেয়েছে, অন্যদিকে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকচিকিৎসাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ধরনের ঝরনার জলের বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন রোগে তারা উপকারী—এ বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই জন-সাধারণের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ ধরনের তৈলমর্দন ও তৈলস্নানের ফলে বিভিন্ন রোগ নিরাময় হয়, এ চিকিৎসা প্রণালী ভারতবর্ষের কেরালা অঞ্চলে আজো প্রচলিত, কিন্তু বর্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে তাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ভারতবর্ষে একেবারেই হয়নি, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশেও তেমন বিধিবদ্ধভাবে হয়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের আধুনিকতম চিকিৎসায়ও কিন্তু প্রচলিত লোকচিকিৎসাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মস্কোর

যে হাসপাতালে আমি ১৯৫৬ সালে ছিলাম, সেখানে যেমন একদিকে নূতনতম ঔষধের ইনজেকশন দেওয়া হ'ত, তেমনি অন্যদিকে লোকচিকিৎসার পরীক্ষিত মসলা দিয়ে স্নানের ব্যবস্থাও করা হ'ত। কৃষ্ণসাগর তীরে সোচী অঞ্চলের বিখ্যাত স্নান ও জলপানের চিকিৎসা আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাইরেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সার্বজনীন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুগের সোভিয়েট সমাজ গড়ে উঠেছে বলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাফল্য তুলনায় কম। আজ পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিক পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, ডিম, মাংস, মাখন বা ফল পায় না। আজো মস্কোর বাজারে সময় সময় ফল বা মাছমাংসের কঠোর অনটন দেখা দেয়। মিস্টার ক্রুশ্চভ তাই দু-তিন বৎসর ধরে কৃষির প্রতি জোর দিয়েছেন বেশী, বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রয়োগে সোভিয়েট জীবনের এই অসাফল্য দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ফলে নতুন ধরনের শস্য নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে, বরফে চাপা পড়লেও তা মরবে না, অনাবৃষ্টি সহ্য করেই তা মানুষের খোরাক যোগাবে। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা হচ্ছে যে আগে যে সমস্ত অঞ্চলে কোন দিন চাস হয়নি, লোকে ভেবেছে সে সমস্ত জমিতে ফসল ফলানো অসম্ভব, সে সব অঞ্চলেও নূতন পুরাতন নানা ধরনের শস্য উৎপাদনের চেষ্টা দিন দিন বাড়ছে। বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে সোভিয়েট রাষ্ট্র খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারবে, আজ সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিল্প ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আরো বেশী ব্যাপক। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানীতে বিজ্ঞানের প্রয়োগে শিল্প-উদ্যোগের যে অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা দিয়েছিল, বর্তমান শতকের মাঝামাঝি সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্টালিন যুগের সমরকেন্দ্রিক মনোভাব বর্তমানে অনেকখানি কেটেছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি বলে আজো যুদ্ধসম্পর্কিত ক্ষেত্রেই সোভিয়েট শিল্প-উদ্যোগের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। কিন্তু মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগানে কুড়ি বৎসরের মধ্যেই আমেরিকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে বলে মিস্টার ক্রুশ্চভ যে ঘোষণা করেছেন, তার ফলে সমস্ত রকমের শিল্প-উদ্যোগের ক্ষেত্রে এক নব-

জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। একদিকে যেমন খাদ্য-বস্ত্রের অভাব, তেমনি অন্যদিকে ঘরবাড়ির অভাবও সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসর যে ভাবে খোরাক-পোশাক বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে, স্বদেশের উৎপাদন বাড়িয়ে ও বিদেশ হতে আমদানী করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাবী মেটাবার চেষ্টা দেখা যায়, তাতে আর পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েট নাগরিকদের দুঃখ কৃচ্ছ্রতার দিন অবসান হবে এ ভরসা তাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এসেছে।

কোন জাতির জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন সর্বদিকেই শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র বলে নয়, রাজসিক শক্তি ও বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রেও পৃথিবীতে বরণীয় হয়ে উঠেছিল। গ্রীক সভ্যতার গৌরবের দিনে গ্রীক প্রতিভা সবদিকেই উৎসারিত হয়েছে, ইসলামের প্রথম যুগে আরব জাতি, এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ড অথবা গ্যেটে শিলারের যুগে জার্মানী সাধনার সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মনে হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের প্রথম যুগের বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষার দ্বারা তাঁরা জাতির প্রত্যেক স্তরে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, চল্লিশ বৎসর পরে নতুন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ জাতি আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। বিজ্ঞানের সাধনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ বহির্শত্রুর আক্রমণ-ভয়কে জয় করেছে, আজ বরং আশঙ্কা যে নবশক্তিদৃপ্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র অপরকে অবহেলা করার ফলে হয়তো পৃথিবীতে নতুন সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কিন্তু আশার কথা এই যে শিক্ষার প্রসারের ফলে সমাজের সকল স্তরেই আজ বিবেচনা করবার মতন লোকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। স্টালিনের আমলে যে একনায়কত্ব সম্ভব ছিল, আজ আর তা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে নতুন নেতৃত্ব অনিবার্য ভাবে দেশের শাসনভার ক্রমশঃ অধিকার করছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিপ্লব-পরবর্তী যুগের গোষ্ঠী। তাই পূর্বকালের আশঙ্কা সন্দেহ বা বিদ্বেষ তাদের মনে ততটা সক্রিয় নয়, বৈজ্ঞানিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তারা নতুন পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের সাধনায় উদগ্রীব।

সোভিয়েট জনসাধারণ শান্তিকামী, অন্যদেশের প্রতি বন্ধুত্ব মনোভাব-শালী—এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দু-এক সপ্তাহের জন্যও যাঁরা

সোভিয়েট রাষ্ট্রে গিয়াছেন, তাঁও শান্তির জন্য জনসাধারণের আকুল স্পৃহা উপলব্ধি করেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, অর্থনৈতিক আদর্শের বৈষম্য ও অনেক ক্ষেত্রে রুশ জীবনদর্শনের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের জন্য যে সম্প্রীতি, পণ্ডিত নেহরুর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, সোভিয়েট জনসাধারণের শান্তিকামনার কথা মনে না রাখলে তা বোঝা যায় না। পণ্ডিত নেহরু সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, কোন সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার ভাগ্যে তা জোটেনি। মিস্টার ক্রুশ্চভের ভারতবর্ষে আগমনের পরেই যে সোভিয়েট নীতি বদলাতে শুরু করেছিল, এটাও আকস্মিক নয়। প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষে সমস্যার অন্ত ছিল না। ১৯১৭ সালে রুশ সাম্রাজ্যের যে অবস্থা, তার তুলনায় ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ, কিন্তু স্বাধীনতালাভের সাত-আট বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যতখানি সিদ্ধিলাভ করেছিল, সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনের পর কুড়ি বৎসরেও তা সম্ভব হয়নি, সে কথা মিস্টার ক্রুশ্চভের মতন তীক্ষ্ণধী নেতার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম ও বহির্শত্রুতা বর্জন করে সকলের সঙ্গে মিত্রতার পথে ভারতবর্ষ চলতে চেয়েছে বলে এদেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের তেমন কোন পরিচয় নেই এবং পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশই ভারতবর্ষকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের কাজে ধনবল জনবল দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। মিস্টার ক্রুশ্চভ আরো দেখেছেন যে এদেশের রাজা মহারাজা জমিদার তালুকদারের কায়েমী স্বার্থ লোপ পেয়েছে, কিন্তু তারা বিদ্রোহ না করে মনেপ্রাণে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। ভারতবর্ষ থেকে ফেরবার কিছুকাল পরেই মিস্টার ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ অপরিহার্য নয়, শান্তির পথে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন দেশ সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এবং সে সমাজের রূপও বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিচারে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ চায় যে যুদ্ধের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাক। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে যে শক্তি এনে দিয়েছে, সে শক্তির সদ্ব্যবহারে মানুষের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর হয়ে ধরাতলে স্বর্গসম সমাজ প্রতিষ্ঠা আজ মানুষের করায়ত্ত। শক্তি অন্ধ; তাই সেই শক্তির যদি

অপব্যবহার হয়, তবে মানবসমাজের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। চল্লিশ বৎসরের শিক্ষাসাধনায় আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। সেই শিক্ষাসাধনার বিকাশে সোভিয়েট নাগরিক যদি আজ সমগ্র বিশ্ব-সমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে তার যে দায়িত্ব, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করে, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও নাগরিকের দান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

—